শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম

বিষয়ে

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতা।

১৩০২—২৭শে শ্রাবণ রবিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে বক্তৃতা।

কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
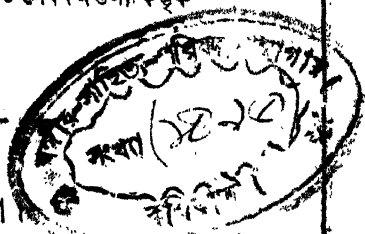
কলিকাতা।

২ নং হরিমোহন বসুর লেন,—"নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

৬১, রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

যে সময়ে যে প্রকার বাতাস বহিয়া থাকে, সে সময়ে সকলকে তাহাই সম্ভোগ করিতে হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বাতাস উঠিয়া থাকে, সে সময়ে সেই বাতাস সকলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ধর্ম্ম-জগতে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এক অভিনব ঝড় উঠিয়া প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার অবস্থায় পতিত হইয়াছে। এইরূপ বাতাস চিরকালই উঠে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহা ঘূর্ণ ঝড় অর্থাৎ সাইক্লোনরূপে দর্শন দিয়াছে। বাতাস উঠিলে গ্রীষ্মপ্রপীড়িত ব্যক্তিরা শীতল হয়, তাহাদের প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু ঘূর্ণঝড়ে শীতল হওয়া দূরে থাক, প্রাণ জুড়ান দূরে থাক, জীবন রক্ষা করা বিষম সঙ্কট হইয়া থাকে। বিশ্বজনীন অর্থাৎ একটি ধর্ম্মসূত্রে সকলকে গ্রথিত করিবার মানসে, এক ধর্ম্ম সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে, সর্ব্বধর্ম্মের একাকার করিবার প্রয়াসে, চারিদিক দিয়া বাতাস উঠিয়াছে, সুতরাং চারিদিকের বায়ুর একস্থানে পরস্পর আঘাতপ্রত্যাঘাতে এক ভীষণ ঘূর্ণ ঝড়ের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। সাইক্লোন হইবার লক্ষণ দেখিলে নাবিকেরা সতর্ক হয়। নৌকা রক্ষা করিবে বলিয়া সুদৃঢ় বন্ধনদিবার নিমিত্ত সুপ্রোথিত কীলক অনুসন্ধান করিয়া তাহার আশ্রয় অবলম্বন করে। আমরাও সেইরূপ, যাহাতে সাইক্লোনের প্রবল বিক্রমে আমাদের জর্জ্জরীভূত জীর্ণ ধর্ম্মভাব-তরী বিচূর্ণীত হইয়া না যায়, তাহার সদুপায় নিরূপণকরণার্থ অদ্য সাধারণসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকারী সনাতন ধর্ম্ম বুঝায়। এই সনাতন ধর্ম্ম প্রকটিত করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উদ্দেশ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কালাবধি ধর্ম্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক মতাবলম্বীরা সর্ব্বত্রে বেদবিহিত কার্য্য দেখিলে সুখী হন, পৌরাণিক মতের উপাসকেরা পুরাণের আধিপত্য স্থাপন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করেন, [illegible] সাধকদিগের

ধারণা এই যে, তন্ত্রের সাধনাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ। হিন্দুদিগের অন্যান্য শাখাপ্রশাখা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাও নিজ নিজ উপাস্য দেবতা ও সাধনপ্রণালীকে জগতের উপাস্যদেবতা ও সনাতন ধর্ম্মপ্রণালী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন। মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত প্রত্যেক নরনারী কাফের ও হিদেনশ্রেণীভুক্ত, তাহাদের কস্মিনকালে কোন সূত্রে কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের সংস্কার। ফলে, সকলেই আপনাপন ধর্ম্মকেই পরিত্রাণের নিদানস্বরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক জগতের কল্যাণার্থ তাহাই প্রচার করিয়া থাকেন। যে সময়ে হিন্দুস্থানে স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত ছিল, সে সময়ে যে যে ভাবের প্রাবল্য হইয়াছিল, সেই সেই ভাবেরই প্রচার হইত। বেদের সময়ে বৈদিক, পুরাণের সময়ে পৌরাণিক, তন্ত্রের সময়ে তান্ত্রিক এবং বুদ্ধাবতারে বৌদ্ধধর্ম্মের কার্য্য হইয়াছে।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার হয়। এই প্রচারকার্য্যকালে সমূহ বলপ্রয়োগও হইত। বর্ত্তমানকালে খ্রীষ্টমতাবলম্বী জাতির একাধিপত্য বিধায়, খ্রীষ্টধর্ম্মেরই বহুল প্রচার হইতেছে। এইরূপে যে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই ধর্ম্মই যেন সনাতন ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই যেন বিশ্বসংসারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সযত্নে বাহুপ্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। সকলেই বলিতেছেন যে, যদ্যপি কাহার এই বিষাদ-পূর্ণ সংসারে দুঃখসঙ্কুল পাঞ্চভৌতিক দেহের সচ্ছন্দতা লাভ এবং বিবিধ অলীক কুসংস্কারবিশিষ্ট আত্মার মুক্তিসাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, তুমি এখনি ত্রিতাপ জ্বালার দুর্ব্বিষহ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, স্বর্গীয় শান্তির শীতলতায় সুস্নিগ্ধ হইবে এবং কালকবলিত হইলে প্রেমময়ের প্রেমনিকেতনে চিরবসতি লাভ করিবে।

এইরূপে সংখ্যাতীত ধর্ম্মপ্রণালী সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সকলেই সকলকে কখন সমাদরের সহিত এবং কখন বীভৎসবাক্যে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাদের দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াও যেন সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই, ধর্ম্মের কার্য্যপরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়াও যেন সম্পূর্ণরূপে দেখেন নাই। তাঁহারা নিরন্তর নিজ সনাতনধর্ম্মের শান্তি নিশান সংস্থাপনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই আত্মাহারা হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের অন্তরের ভাব বাহির করিয়া

আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগকে কখন নিন্দা করা যায় না। স্বীকার করি বটে, নিজ নিজ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ছল, বল এবং কৌশলের সহায়তা লইতে কেহ কখন বিস্মৃত হন না? আমরা একথা সকলেই জানি যে, ধর্ম্ম-প্রচারকালে কেবল আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং অপরের অসারতা প্রতিপাদন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। আমরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠাতা ও প্রচারকদিগের কলহ হিল্লোলে অশান্তির হস্ত হইতে বিমুক্ত পারিতেছি না, যিনা কারণে তাঁহারা সুস্থচিত্তের স্থৈর্য্যভাব চূর্ণ করিতে দক্ষিণ বাম অবলোকন করেন না, তাঁহারা নিজ অভিষ্টসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মপ্রচারকালে কপটতা ও দস্যু বৃত্তির পরিচয় দিতেও কখন লজ্জিত হন না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এই প্রকার অভিনয় দর্শন করিয়াও তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিচারপূর্ব্বক নিন্দা না করিবার হেতু এই যে, যিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনি সেই ধর্ম্মের ভাবে আপনাকে সংগঠিত করিয়া ফেলেন। তাঁহার মন, বুদ্ধি, বিচার, কল্পনা, সেই ভাবানুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে। তিনি আপন ভাবের মধুরতা প্রাণে প্রাণে সম্ভোগ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় অন্যের ভাবের সহিত তুলনা করিতে যাইলে পরস্পর অনৈক্যতা দৃষ্টি হয়, সুতরাং, তাহাকে আপন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুখী করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা যে বহুল অর্থব্যয়ে ও শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক দেশবিদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? তাঁহারা প্রাণে প্রাণে খ্রীষ্টধর্ম্মের রসাস্বাদনপূর্ব্বক সেই রসে পৃথিবীর সমুদয় নরনারীকে অভিষিক্ত করিয়া সুখের পারাবার সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এইরূপে ধর্ম্ম সম্প্রদায় লইয়া বিচার পূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে কাহাকেই দোষারোপ করা যায় না। তাঁহারা যে কেবল অন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, একথা কখনই ি[illegible] করা যায় না।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, যদ্যপি ধর্ম্মবিশেষের ধর্ম্মবিশেষ [illegible] করিবার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের গ্লানি, ধর্ম্মের অসা[illegible] বিবিধ প্রকার ভ্রম বাহির করিয়া দিয়া পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ক[illegible] কেন? আমি বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া দেখিলে [illegible] কখনই দোষারোপ করা যায় না। কারণ উদ্দেশ্যই ধর্ম্মাধর্ম্মসকলের কল্যাণকর

বিষয়। কল্যাণকর কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা কি সাধুবাদের পাত্র নহেন?

মনুষ্য স্বভাব লইয়া যদ্যপি স্থিরভাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে যে কথা কথিত হইল, সে কথায় মতান্তর করিবার কাহারও অধিকার থাকে না। মনুষ্যস্বভাব চায় কি? মনুষ্য স্বভাব কিসের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়? মনের সমতা সংস্থাপন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

মনের সমতা লাভ করা কাহাকে বলে? এই প্রসঙ্গ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের যখন যে বিষয়ের অভাব হয় সেই বিষয়টী পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মন ধাবিত হয় এবং যে পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত উহা কোন ক্রমে স্থির হইতে পারেনা।

মনুষ্যমাত্রেই যেমন কতিপয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হয়, যথা অস্থি, শোণিত, মেদ, মাংস ইত্যাদি। মানসিক বৃত্তিগুলি সম্বন্ধেও তেমনি সকলের সমঅধিকার আছে। ইহা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি। অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি বৃত্তি মনুষ্যের কোথাও থাকে, কোথাও থাকে না, এ প্রকার ঘটনা বিশ্বপতির ব্রহ্মাণ্ডে একেবারেই অপ্রতুল। দয়াদাক্ষিণ্যাদি বৃত্তিগুলিও সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যে এক ভাবের পরিচয় দেয়। শ্রদ্ধাভক্তিও তদ্রূপ। ফলে, একজন ব্যক্তিতে স্থূলেই হউক, কিম্বা সূক্ষ্মেই হউক, অথবা কারণ ও মহাকারণেই হউক, যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমুদয় মনুষ্যে তাহাই আছে; কোথাও ইহার বিন্দু-বিসর্গ প্রভেদ হইতে পারে না। এমন মনুষ্য কি কেহ দেখিয়াছেন, যাহার দেহে শোণিতের পরিবর্ত্তে জল কিম্বা তৈল অথবা দুগ্ধ কার্য্য করিতেছে? স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্য কি ব্যক্তিবিশেষে সুতার দ্বারা নির্ব্বাহ হয়? কখন নহে। ক্ষুধায় আহার এবং পিপাসায় জলপান করা মনুষ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের কি ব্যতিক্রম কোথায় হয়? এই নিমিত্ত মনুষ্যেরা সর্ব্ববিষয়ে সম-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখিত হইলে, প্রকৃত কথাই বলা হয়।

আপন দেহের অতি দূরতম স্থানে যদ্যপি সমতাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে মনের সমতা-ভঙ্গ হওয়া অনিবার্য্য। যেমন, পাদমূলে কণ্টক বিদ্ধ অথবা অঙ্গুলিপ্রান্তে স্ফোটকাদি হইলে, যে পর্য্যন্ত কণ্টক বাহির হইয়া না যায়, কিম্বা স্ফোটক আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত মনের সমতা স্থাপন হইতে পারে না। কি রূপে কণ্টক বাহির হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে স্ফোটকের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, মনের তাহাই একমাত্র জপমালা হইয়া

থাকে। মনের এই প্রকার সমতা ভঙ্গ হওয়া যে কেবল আপন শরীরে আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে। আপন পরিবারবর্গের যদ্যপি ঐরূপ কোন প্রকার দৈহিক সমতা বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ হয়, তাহা হইলে সেই হিল্লোল সংসারের সর্ব্বত্রে সমভাবে পরিব্যপ্ত হইয়া থাকে। বাটীর সকল নরনারীই উদ্বিগ্নযুক্ত হইয়া পড়েন। উদ্বিগ্ন হওয়াই মনের সমতাচ্যুতির লক্ষণস্বরূপ। আধিভৌতিক উপদ্রব যেরূপ মানসিক সমতা বিচ্ছিন্ন করিবার হেতুবিশেষ হয়, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক কারণেও সেইরূপ মনের সমতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্পদংশন, ব্যাঘ্রাক্রমণ, বজ্রাঘাতাদি বিভীষিকায় এবং আপন দেহের অধর্ম্মকার্য্যাদির পরিণাম চিন্তায় মনের কখন স্থৈর্য্যভাব সংরক্ষিত হয় না। পরিবার সম্বন্ধীয় অন্যের তদবস্থা হইলে তাহার নিজের মানসিক চিন্তার ন্যায় অন্যান্য সকলের তদ্রূপই চিন্তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহার যেরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়, তাহার আত্মীয় সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে।

আত্মীয় সম্বন্ধ বলিলে কি বুঝায়? অর্থাৎ যাহারা আপনার। আপনার বলি কাহাকে? শোণিত শুক্রের সম্বন্ধ বিচারপূর্ব্বক আপনার পর বিচার করা হয়, ইহাই সাধারণ পারিবারিক সম্বন্ধ। এই শোণিত শুক্রের সম্বন্ধ সীমাবিশিষ্ট আপন পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া অন্তর দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে অতি বিস্তীর্ণ ভাবের পরিচয় দেয়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিবার সংগঠন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বাপর বংশানুক্রম বিচার করিতে যাইলে, পরিশেষে এক শোণিত শুক্রই সকলের নিদান বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বহুবিধ জাতি ও পরিবার এককালে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারা সৃজিত হয় নাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহা হইতেই হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবীর নরনারী সৃজিত হইয়াছে বলিলে সত্য কথা বলা হয়। সে হিসাবে সমুদয় নর নারী এক পরিবারস্থিত, সুতরাং, পরস্পরের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বিধায় একের শারীরিক বা মানসিক সমতা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা সর্ব্বসাধারণকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক মঙ্গল-জনক কার্য্যের নিমিত্ত সকলকেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়।

সমতা সংস্থাপন করা বিশ্বপতির প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং, তাহার

বৈপরীত্য সংঘটনা করা স্বজিত পদার্থের শক্তির অতীত কার্য্য। শরীরের কোন স্থান বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তথায় সমতা স্থাপন হইতে পারে না এবং সেই কার্য্য স্বয়ং প্রকৃতিই সম্পাদন করিয়া থাকেন,চিকিৎসকেরা প্রকৃতির অভিপ্রায়ানুযায়ী কতিপয় আজ্ঞা পালন করিয়া যান। যখন কোন স্থানে বায়ুর সমতা ভ্রষ্ট হয়, তথাকার সমতা সংস্থাপনের নিমিত্ত বায়ুই আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় বিধান। জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল উত্তোলন করাই হউক, কিম্বা কল বসাইয়া প্রচুর পরিমাণে জল আকর্ষণ করাই হউক, জলাশয়ের সমতা বিচ্ছিন্ন হয় না। এতদ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে, কঠিন পদার্থের সমতা স্থাপন হওয়া সময়সাপেক্ষ, কিন্তু তরল পদার্থ সম্বন্ধে এক অনুপল সময়ও বিলম্ব হয় না।

প্রকৃতির এই নিয়মানুসারে আমরা সকলেই পরিচালিত হইতে বাধ্য। সুতরাং, মনুষ্যজাতির শারীরিক বা মানসিক ভাব সম্বন্ধীয় কোন প্রকার অসমতা উপস্থিত হইলে তথায় পুনঃ সমতা সংস্থাপনের নিমিত্ত সেই প্রকার ভাবের অবশ্যই কার্য্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভাব প্রচার করা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, সুতরাং, তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না।

প্রাকৃতিক নিয়মের চরণে জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক, সকলেই মস্তকাবনত করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা যদ্যপি সমতা স্থাপন করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না বটে,কিন্তু কথা হইতেছে যে, যথায় সমতা স্থাপন হয় তথায় অশান্তি থাকিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা সমতাসংস্থাপন হওয়া দূরে থাকুক, অশান্তির বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সমতা স্থাপিত হইবে কোথায়? আমি বলি আমার ধর্ম্মই বিশ্ব-জনীন, ইহার দ্বারা সমতা স্থাপন হইবে; তুমি বল তোমার ধর্ম্মই সমতাস্থাপনের একমাত্র হেতুস্বরূপ। এইরূপে পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ সংঘটনা হওয়া ব্যতীত, অবিশ্রাম সমতাভঙ্গের তিক্তরসাস্বাদন ব্যতীত আনন্দের আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্মজগতের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব আপনি আপনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গা দেখাইয়াছেন তাহার আশ্রয় লইলে এই চিরাকাঙ্ক্ষিত

সর্ব্বজনকল্যানকর বিষয়টীর যথার্থ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর"।

তিনি বলিতেন যে কাহাকে কোন বিষয় শিখাইয়া না দিলে সে কখন আপনি তাহা শিক্ষা করিতে পারে না। শিক্ষার পরে উহা অভ্যাস করিলে তবে তাহা হইতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন যে, "নাক্ তেরা খেটি" তবলার বোল মুখে শিক্ষা করিতে এক মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগে না, কিন্তু হাতে অভ্যাস করিয়া বাদ্যযন্ত্রে বোল্‌টি স্পষ্ট করিয়া বাহির করিতে ছয় মাস লাগে। অর্থাৎ যে কোন বিষয় হউক, সে বিষয়টির আদ্যোপান্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া আপন শক্তিঅনুসারে কার্য্য করিলে কার্য্যানুরূপ ফল ফলে। তিনি আরও বলিতেন যে, পাঁজিতে লেখা থাকে যে এ বৎসরে ২০ আড়ি জল হইবে। কিন্তু পাঁজি নিংড়াইলে কি এক ফোঁটা জল বাহির হইতে পারে? এই নিমিত্ত সকলকে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য বলিতেন যে, সিদ্ধি খাইলে আনন্দ হয়, কিন্তু সিদ্ধি সিদ্ধি করিয়া যদ্যপি জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কেহ চিৎকার করে, তাহা হইলে সে কখনই সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যদ্যপি সে অন্যমনস্ক হইয়া যাইবার নিমিত্ত সাময়িক শান্তির আভাস প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সিদ্ধির আনন্দ কহা যাইতে পারে না। সিদ্ধির আনন্দ লাভ করিতে হইলে সিদ্ধি আনয়ন করিতে হইবে; কেবল আনয়ন করিলে হইবে না, তাহাকে ঘুঁটিতে হইবে; কেবল মুখের ভিতর রাখিলেও হইবে না, তাহা গিলিয়া ফেলিতে হইবে; তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ করিলে হইবে না, পেটের ভিতর কিয়ৎকাল থাকিলে তবে নেশা হইবে; তখন সে আনন্দে জয় জয় কালী জয় কালী বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে।

কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া তাহা অভ্যাস অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত না করিলে যেরূপ কোন কার্য্যেরই হয় না, শিক্ষাবিহীন কার্য্যেও সেইরূপ প্রতি পদে পদে বিভীষিকা এবং বিড়ম্বনা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক কার্য্যেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে আফিসের একখানি সামান্য চিঠি লিখিতে দিলে সে দশদিক্ অন্ধকার দেখে। তাহার অপরাধ কি? সে অফিসের কার্য্য কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া কখন করে নাই, কেমন করিয়া তাহার দ্বারা উহা সম্পন্ন হইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে! একদিন জনৈক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যা-

পক ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে সঙ্কলিত পরীক্ষাগুলি আবৃত্ত করিতেছিলেন। তিনি একটি সোডাওয়াটারের বোতলে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন বাষ্পদ্বয় পরিপূর্ণ করিয়া ছিপির দ্বারা বোতলের মুখটি আবদ্ধ করণান্তে উহা আপনার দিকে রাখিয়া অপর দিকে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন।

ইহাপেক্ষা আর একটি রহস্যজনক ঘটনা বলিতেছি তদ্দ্বারা আনুমানিক শিক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষিতের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। একদা সংস্কৃতশিক্ষিত একটি ব্রাহ্মণ কোন কায়স্থের বাটীতে নৈমিত্তিক কার্য্যবিশেষ সাধন করিতে আসিয়াছিলেন। গৃহস্থকে প্রণবসংযুক্ত করিয়া সমুদয় মন্ত্র পড়াইলেন এবং মাতুল গোত্রে পিতৃ পক্ষের উল্লেখ ও পিতৃগোত্রে মাতুল পক্ষের উল্লেখ করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইলেম। যখন গোত্র লইয়া বিপর্য্যয় করেন, তখন তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করায় কহিলেন, "উহাতে আর কি দোষ হইয়াছে? মন্ত্র পাঠে যদ্যপি ব্যাকরণের ভুল হইত, তাহা হইলে দোষস্বীকার করিতাম।" প্রণব সংযোগে মন্ত্র পাঠ করিবার দ্বিজ ব্যতীত অন্যের অধিকার নাই, ইহা সামাজিক ব্যক্তিমাত্রে জানেন। তিনি কি হিসাবে তাহা উলঙ্ঘন করিলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে, "সামাজিক কার্য্যে পটু ব্রাহ্মণেরা সকলেই মূর্খ, শুদ্ধাশুদ্ধের কোন সংস্রব তাঁহারা রাখেন না।"

এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে, চিকিৎসকেরা যেমন কিছু ঔষধ সেবন এবং কিছু মালিশ করিতে দেয়, তেমনি শিক্ষা এবং কার্য্য উভয়েরই প্রয়োজন।

কোন দেশে গমন করিতে হইলে তথায় যাইবার পথ এবং পথের কোথায় কিরূপ অবস্থা বিশেষ তদন্ত করিয়া না লইলে বাস্তবিক পথিকের ক্লেশ হইবারই সম্ভাবনা। ধর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত না হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, অথবা কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল মর্ম্ম নিরূপণ করিয়া বেড়ান, উভয়স্থলেই বিড়ম্বনা সংঘটিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অতি পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে স্থানে যে কোন ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তথায় রামকৃষ্ণদেবব্যতীত "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" এরূপ উপদেশ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে কেহ আদেশ করেন নাই এবং কেহ

নিজেও তাহা কার্য্যে করিয়া দেখেন নাই বা দেখান নাই, সুতরাং, এরূপ ভাবের কার্য্যেরও কখন সূচনা হয় নাই।

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে চমকিত হইয়া বলিতে পারেন যে, অদ্বৈত জ্ঞানের নিমিত্তই ভারতবর্ষ চিরবিখ্যাত। বেদান্তাদি শাস্ত্র তাহার ভিত্তিভূমি এবং আমাদের অরণ্য ও গিরিগুহাবাসী ঋষিরা জাজ্বল্য প্রমাণ সত্ত্বে রামকৃষ্ণদেবকে অদ্বৈত ভাবের কার্য্য করিবার কর্ত্তা বলা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইল? আমি অবনতমস্তকে স্বীকার করি যে, অদ্বৈত জ্ঞান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব আবিষ্কারক নহেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর।" অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান যাহাকে বলে তাহা অগ্রে লাভ করিয়া তদন্তর যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ যে কোন প্রকার সাধন ভজন করিতে হয়, তাহা করিলে তবে সর্ব্বত্রে সমতা স্থাপন হইবে। অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত সমতা সংস্থাপনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। এই কথা ইতি-পূর্ব্বে কেহ বলেন নাই, কেহ তাহা করেন নাই, কিম্বা কেহ কাহাকে অনুষ্ঠান করিতে বলেনও নাই।

আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্ষেপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অদ্বৈতজ্ঞান বিষয়ক এবং দ্বৈতজ্ঞান বিষয়ক। অদ্বৈতজ্ঞানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় কার্য্যকে মায়ার অন্তর্গত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী পরমহংস কি দশভুজার সম্মুখে মস্তকাবনত করিতে পারেন? না রামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ, মহম্মদ এবং খ্রীষ্টকে অবতার, অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মের লীলারূপ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন? কখন না। দ্বৈতবাদীদিগের কথাই নাই। ইঁহারাই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ইঁহারাই আপনাপন ভাবকে অদ্বৈত জ্ঞান কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি যে ভাবে ধর্ম্ম সাধন বা শিক্ষা করেন, তিনি সেই ভাবকেই অদ্বৈত জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাহাতে সকলকে আকর্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বত্রে সমতা সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়ান।

ধর্ম্মরাজ্যের কার্য্যক্ষেত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে এই দেখা যায় যে, অদ্বৈতজ্ঞানীরা দ্বৈতজ্ঞানকে পরিত্যাগ করেন এবং দ্বৈত ভাবের উপাসকেরা তাহাকেই অদ্বৈত জ্ঞান কহেন, সুতরাং, তথায় অসামঞ্জস্য-ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অসামঞ্জস্য ভাব দূরীকরণ করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা

তাহা কর বলিয়া গিয়াছেন। এই সর্ব্বকল্যাণকর উপদেশবাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

আমরা পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পদার্থদিগের ভাববৈচিত্র্য দেখিতে পাই। এমন কি এক পদার্থেরই ভাবের ইয়ত্তা করা দুরূহ হইয়া উঠে। পেয়ারা একটি পদার্থ, কিন্তু এক প্রকার আস্বাদন ও আকৃতিপ্রকৃতি-বিশিষ্ট পেয়ারা হয় না। আঁব, কাঁঠাল প্রভৃতি সকল প্রকার ফলমূল লইয়া বিচার করিলে সর্ব্বত্রে এইরূপ বহুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌রাজ্যের প্রত্যেক তরু, লতা, গুল্ম, ওষধি ও তৃণাদি বহুভাবব্যঞ্জকরূপে প্রতীয়মান হয়। জান্তবরাজ্য অবলোকন করিলে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। প্রতিগৃহে প্রত্যেক পরিজন পরস্পর পার্থেক্যের পূর্ণ পরিচয় দেয়। গৃহ ছাড়িয়া পল্লীতে যাইলে এই পার্থক্য জ্ঞান সম্যকরূপে বর্দ্ধিত হয়। পল্লী অতিক্রম করিয়া যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই পার্থক্যের চূড়ান্ত হইয়া আইসে। আপন গৃহে বংশক্রমানুসারে সম্বন্ধ ও ভাবের ইতরবিশেষ হয়। পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ, অতিবৃদ্ধপিতামহ প্রভৃতি কয়েক পুরুষ উর্দ্ধে যাইলে ক্রমেই সম্বন্ধের ব্যবধান বাড়িয়া যায়। পিতার সহিত যে সম্বন্ধ, পিতামহের সহিত সেরূপ হয় না। পিতা কিম্বা পিতৃব্যাদি বিয়োগে পিতামহের যে প্রকার ক্লেশ হয়, পৌত্র বিয়োগে তাঁহার সে প্রকার ক্লেশ হইতেপারে না। পল্লীর কথায় প্রয়োজন নাই, তথায় একেবারে আত্মসম্বন্ধ চ্যুত হইয়া যায়। দেশদেশান্তরের কথা কথার অতীত বিষয়। জীব জন্তু কীট পতঙ্গের গণনা করিতে যাইলে মনুষ্যের ধারণাশক্তি পরাজিত হইয়া যায়। খনিজ এবং অন্যান্য পদার্থ লইয়া আর দৃষ্টান্ত বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা হইতেছে যে, বহির্জ্জগতের স্থূল পদার্থপুঞ্জের আলোচনায় মানবগণ এতদূর পার্থক্যবোধক জ্ঞানলাভ করে, যে সেই সকল সংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বিশেষ যত্ন ও অভ্যাসের আবশ্যক হইয়া থাকে।

স্থূল জগতের স্থূল জ্ঞান আপনিই সঞ্চারিত হয়। এই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। লীলাময়ের বিশ্বরচনার সুব্যবস্থাই উপদেষ্টার কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলের কার্য্য পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন। কাহার সহিত কাহারও সামঞ্জস্য বা ঐক্য হওয়া তাহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, বিশ্বসংসার যেন ভালমন্দের সংগ্রামক্ষেত্রবিশেষ। যে দিকে এবং যাহার দিকে দর্শন করা যায়, তাহাকে স্বতন্ত্র ও স্বস্বপ্রধান বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহার সহিত কাহার তুলনা হয় না। একটী

মনুষ্যের মত ঠিক আর একটী মনুষ্য পাওয়া যায় না, একটী মনুষ্যের বর্ণের ন্যায় আর এক জনের বর্ণ মিলে না, এক জনের প্রকৃতির মত আর এক জনের প্রকৃতি হয় না, এক জনের কার্য্যকলাপের সহিত আর এক জনের কার্য্যকলাপের সাদৃশ্য থাকে না। আমি যাহা বুঝি, তুমি তাহা বুঝিবে না, আমি যাহা করি, তুমি তাহা কখন করিবে না, আমি যাহা বলি, তুমি তাহা বলিবে না, ইহাই স্থূলের পরিচয়। দেখিতেছি বিষ, দেখিতেছি অমৃত, দেখিতেছি সাধু, দেখিতেছি অসাধু, দেখিতেছি বিদ্বান, দেখিতেছি মূর্খ, দেখিতেছি রূপবান্, দেখিতেছি কুৎসিত, দেখিতেছি বলিষ্ঠ, দেখিতেছি দুর্ব্বল, দেখিতেছি নিরোগী, দেখিতেছি রোগী, দেখিতেছি ধার্ম্মিক, দেখিতেছি অধার্ম্মিক, দেখিতেছি সতী, দেখিতেছি অসতী, দেখিতেছি দিন দেখিতেছি রাত্রি। এরূপ পার্থক্যতাপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি করিলে মনে ইহাদের সংস্কার পতিত হয় এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকে।

সাধারণ নরনারী এই ভাবাপন্ন হইয়া যতই বয়োবৃদ্ধি লাভ করে, পরবর্ত্তী শিক্ষা এবং অবস্থার প্রসাদে তাহাদের পার্থক্যজ্ঞান ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন আমি অমুক, আমি ধনী, আমি মানী, আমি পণ্ডিত, আমি সাধু, আমি যাহা বুঝি এমন আর কেহ বুঝিতে পারে না, আমার অমুক, অমুক আমার কেহ নয়, ইত্যাকার ভাবে দিন যাপন করিয়া থাকে। সাধারণ নরনারীর এই অবস্থা। এই অবস্থায় তাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, সুতরাং, তাহাও মানসিক ধারণা এবং সংস্কারবশতঃ পার্থক্যভাবে রঞ্জিত হইয়া যায়। সুতরাং, সে অবস্থায় তাহাদের পরস্পর অনৈক্যতা ব্যতীত সমতা উপলব্ধি করিবার শক্তি একবারেই অপনীত হয়। সেইজন্য সমতা স্থাপনের নিমিত্ত অপরকে আপন ভাবে ও ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন করিবার সর্ব্বদা আয়োজন হইয়া থাকে।

স্থূলে থাকিয়া স্থূলের পরাক্রম অতিক্রম করিয়া কখন কার্য্য করা যায় না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে বলিয়াছেন। অদ্বৈতজ্ঞান লাভপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিলে কালে সর্ব্বত্রে আকাঙ্ক্ষিত সমতা স্থাপন হইয়া যাইবে।

অদ্বৈতজ্ঞান বলিলে সাধারণ হিন্দুমত যাহা, তাহা রামকৃষ্ণদেবের অভি- প্রায় নহে। সাধারণ হিন্দুমতে অদ্বৈতজ্ঞানকে ব্রহ্মস্বরূপ কহা যায় এবং

সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্থূল জগৎকে মায়া বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন কি, আপনার শরীর, মন এবং মানসিক বৃত্তি ও তৎপ্রসূত কার্য্যকলাপ সমুদয় মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণ ধারণা এবং বিশ্বাস না করিতে পারিলে অদ্বৈতজ্ঞানী হওয়া যায় না। এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানে ভাব, প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই স্থান পায় না, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের স্বাতন্ত্র থাকে না, নিত্যলীলা একাকার হইয়া যায়, সাকার রূপের মহাপ্রলয় হয়, এমন কি, উপাস্যউপাসকের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া আইসে।

এইরূপ অদ্বৈতবাদী আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাহাই সকলের পরিণাম এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্মের উপসংহার করেন।

যদ্যপি এই অদ্বৈতজ্ঞানকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রে সমতা স্থাপিত না হইয়া বরং মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবার কথা। এই ভাবকে মহাপ্রলয় ব্যতীত অন্য শব্দে উল্লেখ করা যায় না। মহাপ্রলয়ে স্থূল জগৎ একাকার হইয়া যায়, বিশ্ব জগতের বিবিধ নয়নানন্দপ্রদ বস্তু সকল আকারবিহীন হইয়া অবস্থান্তর লাভ করে, এই নিমিত্ত উহাকে মহাপ্রলয় কহা যায়। অদ্বৈত জ্ঞানে বরং তাহা অপেক্ষা দূরতম স্থানে গমন করিতে হয়, সুতরাং, মহাপ্রলয় শব্দের দ্বারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের চূর্ণবিচূর্ণতা ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে।

যদ্যপি অদ্বৈত জ্ঞানকেই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম এবং প্রত্যেকে অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ভাব আর ধর্ম্ম বলিয়া স্থান পাইতে পারে না, একথা অদ্বৈতবাদীরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব পুরাণ এবং তন্ত্র কল্পিত গ্রন্থ, উহারা মনুষ্যদিগকে নিরয়কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার পন্থাবিশেষ বলিয়া অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে তাহা কখনও স্বীকার করা যায় না। তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের এবং অন্যান্য সমুদয় জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রও সত্য। সুতরাং, কেবল অদ্বৈতজ্ঞানকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলা যায় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, রামকৃষ্ণদেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া পুরাণ, তন্ত্র এবং যবন ও ম্লেচ্ছাদির ধর্ম্মশাস্ত্রকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব কেন?

বিশেষতঃ অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুশাস্ত্রোক্ত, অতি প্রাচীন কাল হইতে যোগপরায়ণ আর্য্য ঋষিমুনির পরম আদরের সামগ্রী এবং হিন্দু জাতির ইহাই একমাত্র স্পর্দ্ধার বিষয় বলিয়া অদ্যাপি সর্ব্ববুধমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে। রামকৃষ্ণদেব সেই অদ্বৈতজ্ঞানকে হিন্দুর আধুনিক কল্পিত এবং বিজাতীয় শাস্ত্রাদির ভাবের সহিত সমতা করায় কি অন্যায় কার্য্য করেন নাই? আমি এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অতি বিনীতভাবে বলিতেছি যে, প্রভুর উপদেশের দ্বারা ধর্ম্ম লইয়া তুলনা অর্থাৎ কাহারও ইতরবিশেষ করিবার কোন কথাই দেখা যায় না। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। ধর্ম্ম বলিলে অসত্য বা কাল্পনিক মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত-জ্ঞানগর্ভ রচনাবিশেষ নহে। তিনি এই নিমিত্তই অদ্বৈত জ্ঞান অগ্রে লাভপূর্ব্বক পরিশেষে কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশের তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখিলে সর্ব্বসংশয় ভঞ্জন হইয়া যাইবে।

অদ্বৈতজ্ঞান অর্থে এক জ্ঞান বুঝায়। যে জ্ঞানে দুইটী ভাব থাকিতে পারে না, এমন জ্ঞানকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান বলা যায়। অদ্বৈতজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে কোথায় যাইতে হইবে? কে তাহার উপদেশ দিবেন এবং কোন পুস্তকইবা অধ্যয়ন করা যাইবে? হিন্দুশাস্ত্র, মুসলমানশাস্ত্র, খৃষ্টানশাস্ত্র এই জ্ঞানলাভের সুলভ সোপান? কোন শাস্ত্রই অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ নহে। হিন্দুশাস্ত্র আলোড়ন করিলে যে প্রকার অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। খ্রীষ্ট ও মুসলমানগ্রন্থে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের স্থান কোথায়? রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে, বিশ্বপতির তত্ত্ব জানিতে হইলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তিনি এই স্থানে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেন, যেমন কাহার কত সম্পত্তি আছে, বাহিরের লোকের আনুমানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা কখন স্থির হইতে পারে না। সেই ব্যক্তি যদ্যপি কাহাকে সিন্দুক খুলিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে প্রকৃত সমাচার পাওয়া যাইতে পারে। ভগবান সম্বন্ধে সে প্রকার কার্য্য কিরূপে হইবে?

যদ্যপি কালীদাসকে কবিকুলচূড়ামণি বলিবার হেতু অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ গ্রন্থাদি দেখিতে হয়। মহাপ্রভু অবতার বিশেষ কেন? তিনি অবতার, যেহেতু, তাঁহার কার্য্যকলাপে অধা-

নুষী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে, কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার শক্তি বা গুণ প্রকাশ পায়।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশ্বরচনা পর্য্যালোচনা করাই কর্ত্তব্য।

বিশ্বসংসারে স্থূলে সমুদয় পদার্থই বহুভাবের পরিচায়ক। কিন্তু স্থূল ভাব হইতে অন্তরদৃষ্টির দ্বারা উহাদের আভ্যন্তরিক গঠনাদি নিরীক্ষণ করিলে এক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে প্রকাশিত হয়। হীরক, গ্র্যাফাইট, কয়লা, কাষ্ঠ, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, ফল, মুল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে অন্তরদৃষ্টিযোগে অতি সুন্দর অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করা যায়। অর্থাৎ এই বহু বিচিত্র আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারের পদার্থনিচয়ে এক অদ্বিতীয় অঙ্গার বিরাজ করে। হীরকে অঙ্গার, একথা প্রক্রিয়াশীল বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কাহাকেও কি বুঝান যায়? পার্থিব পদার্থের মধ্যে হীরক অপেক্ষা মহামূল্যের বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, ইহা রাজরাজে-শ্বরের শিরোদেশে স্থান পায়। ইহা অঙ্গার! কয়লা!! যে হীরকের মূল্যের কথা শ্রবণ করিলে অমূল্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার করা হয়, তাহাকে কয়লা বলা হয় কেন? একদা জনৈক ফরাসীদেশের সৈনিক পুরুষ আমাদের কোন ঠাকুরের একটী হীরকের চক্ষু অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। এই হীরকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি কপোতের ডিম্বের ন্যায়। ইহা মহারাজ্ঞী ক্যাথারাইন বিক্রেতাকে ৯০,০০ হাজার পাউণ্ড নগদমূল্য, এতদ্ব্যতীত ৪০০০ পাউণ্ড বার্ষিক দিয়াছিলেন। এই হীরকখানির ওজনের এক খানির কয়লার মূল্য কত? কিন্তু স্থূলে উভয়ের পার্থক্যের ইয়ত্তা নাই। চিনি উপাদেয় সামগ্রী, তাহাকে কয়লা বলিলে স্থূল দ্রষ্টা কি উপহাস করিবে না? এইরূপে উদ্ভিজ্জ, জান্তব এবং খনিজ বহুবিধ পদার্থে কয়লা অদ্বিতীয় ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কয়লা সম্বন্ধে যাহার এই প্রকার অদ্বিতীয় জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তাহার চক্ষে হীরকও যে বস্তু, কয়লাও সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি না হইবে কেন? যদিও হীরক এবং কয়লা জ্ঞানদৃষ্টিতে এক বলিয়া ধারণা হইল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক, হীরক এবং কয়লাকে স্থূলে এক পদার্থ বলিবেন না। হীরককে হীরক এবং কয়লাকে কয়লা বলিতে বাধ্য। হীরক এবং কয়লা অবস্থাবিশেষে একাকার হয় এবং অবস্থাবিশেষে পৃথক হইয়া থাকে। যতক্ষণ হীরক ততক্ষণ উহা হীরক, উহা অমূল্য পদার্থ। হীরকের অবস্থান্তর হইলে তখন সে কয়লা, আর তাহাকে হীরক বলা যাইবে না। অতএব এক পদার্থের অবস্থান্তরই

বিবিধ পৃথকধর্ম্মযুক্ত পদার্থের সৃষ্টির কারণস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান লাভ করা রামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

এক পদার্থের অবস্থাগত প্রভেদ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, জল এক বস্তু। গঙ্গার জলও জল, সাগরের জলও জল, পুষ্করিণীর জলও জল, কূপের জলও জল, নর্দ্দামার জলও জল, প্রস্রাবও জল, মুখের লালও জল, সর্ব্বত্রে এক, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার অবস্থান্তর বিধায় নানাপ্রকার নামে কথিত হয়। সর্ব্বত্রে এক প্রকার জল বলিয়া গঙ্গাজলের সহিত অন্য জলের তুলনা হয় না। গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে অন্য জল ব্যবহার করা যায় না। জল হিসাবে সকলকে জল বলা যাইবে, কিন্তু স্থূলে তাহাদের ধর্ম্মহিসাবে পৃথক পৃথক ভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে।

জড় পদার্থ কিম্বা জড়-চেতন পদার্থ লইয়া বিচার করিলে কয়লা এবং জলের দৃষ্টান্তের ন্যায় এক পদার্থে উপনীত হওয়া যায় এবং তাহা হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সেই এক পদার্থের বহুল স্বাতন্ত্র বিকাশ দেখিয়া অদ্বৈত-জ্ঞানী আনন্দে মাতিয়া উঠেন। এই বৈজ্ঞানিক মীমাংসাবিষয়টী আমি ইতিপূর্ব্বের বক্তৃতাদিতে উপর্য্যুপরি নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এ স্থলে সংক্ষেপে উহার উপসংহার করিতে বাধ্য হইতেছি। স্থূলে যে সকল পদার্থ দেখা যায়, তাহারা কতিপয় অদ্বিতীয় পদার্থের সংযোগসম্ভূত। ঐ অদ্বিতীয় পদার্থদিগের মধ্যে অঙ্গারও উল্লেখিত হয়। অঙ্গার যে কোন যৌগিকে হউক, যে কোন রূপে হউক, উহা অঙ্গার। বিশুদ্ধ অঙ্গারের ধর্ম্ম যাহা, রূপান্তর কিম্বা সংযোগে তাহা থাকে না; অর্থাৎ অদ্বিতীয় অঙ্গার এবং রূপান্তরিত অঙ্গারের ধর্ম্ম ও কার্য্য এক প্রকার নহে। যদিও অদ্বিতীয় অঙ্গারের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও রূপান্তরিত অঙ্গারের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র বলা হইল বটে, কিন্তু অদ্বিতীয় অবস্থায় অঙ্গারের যে ধর্ম্ম এবং যৌগিকাবস্থায় যে ধর্ম্ম তাহাও অঙ্গা-রের ধর্ম্মই বলিতে হইবে। উভয়ক্ষেত্রে এক পদার্থও কহিতে হইবে, কিন্তু এক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে মনুষ্য লইয়া বিচার করিয়া দেখা হউক। মনুষ্য উল্লেখিত কতিপয় অদ্বিতীয় পদার্থের যোগে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথা, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, গন্ধক, ফস্ফরাস্, পোটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্, লৌহ ইত্যাদি। এই অদ্বিতীয় পদার্থসকলের মধ্যে লৌহ এবং গন্ধক আবালবৃদ্ধবণিতার পরিচিত বস্তু। মনুষ্য শরীরে গন্ধক আছে,

লৌহ আছে, একথা কি সাধারণ মনুষ্য ধারণা করিতে পারিবে ? লৌহ বলিলে তাহাদের সংস্কার আসিয়া ছুরি, কাঁচি, পেরেক,বঁটি রাস্তার রেল,গঙ্গার সাঁকো দেখাইয়া দিবে। গঙ্গার সাঁকোতে লৌহ আছে, তাহা মনুষ্য শরীরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, এই ভাবিয়া সে কুলকিনারা দেখিতে পাইবে না। গন্ধকের ব্যবহার সকলেই জানে, ইহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে অমনি জ্বলিয়া উঠে এবং শ্বাসক্লেশোৎপাদক কটু ধূমপুঞ্জ বাহির হয়। মনুষ্যদেহে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গন্ধকে বারুদ হয়, মনুষ্য দেহ দ্বারা বারুদ প্রস্তুত করা যায় না। অদ্বিতীয় লৌহ এবং গন্ধকের ধর্ম্মের সহিত যৌগিকলৌহ এবং গন্ধকের ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকে না,পার্থিব স্থূলপদার্থের রীতি এই,কিন্তু তাহা বলিয়া যে গন্ধক নাই বা লৌহ নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। একটী মনুষ্যশরীর যে সকল পদার্থে গঠিত হয়, ভূমণ্ডলস্থিত সমুদয় মনুষ্য সেই সেই পদার্থের সেই সেই পরিমাণে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা এক প্রকার অদ্বৈতজ্ঞান কহা যায়। এই জ্ঞান অবশ্য মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে বলিতে হইবে। এই জ্ঞান লাভপূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য মিলাইলে সর্ব্বত্রে একপ্রকারই প্রতীয়মান হয়। শোণিতের কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, অস্থির কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, মস্তিষ্কের কার্য্য সর্ব্বত্রে সমান, দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চক্ষু সকলেরই হয়। পরে শরীরের ভিন্ন ভাবের যে প্রকার কার্য্য তাহাও সর্ব্বত্রে এক প্রকার। ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় জলপান, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি বৃত্তিদিগের উদয়, ক্রমে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন হওয়াও সর্ব্বত্রে সমান। দয়াদাক্ষিণ্যাদির কার্য্য কোন ব্যক্তির ইতরবিশেষ হয় না, কিন্তু উল্লেখিত কার্য্যপদ্ধতির স্থিরতা নাই। এক ভাব সর্ব্বত্রে দেখা যায় না।

আহার করা মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। যে জাতি হউক, যে বর্ণ হউক, যেরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হউক, সকলেই আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা তাঁহারা আহার করেন, তাহা কোনমতে সর্ব্বত্রে সমান হইতে পারে না। কেহ হবিষ্যান্ন আহারে তুষ্টি লাভ করেন, কেহ মৎসাদির সম্বন্ধ ব্যতীত এক গ্রাস অন্ন গলধঃস্থ করিতে অসমর্থ হন, কেহ মৎসাদির আড়ম্বর ভিন্ন পশুর আহার মনে করেন। হিন্দুর সাত্বিকাহারে মাছ মাংসের সম্বন্ধ নিষেধ, রাজসিক ও তামসিক আহারে মৎসমাংসের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর আহারের সহিত যবন এবং ম্লেচ্ছের আহারের তুলনা হয় না। আহারের

স্থূল ভাব দেখিলে কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু উদ্দেশ্যে সকলই এক ভাবের পরিচয় দেয়। মানব প্রকৃতির আর একটী দৃষ্টান্ত গৃহীত হউক। দয়া, এই বৃত্তিটীর দ্বারা পরদুঃখনিবারণ ও পরোপকার কার্য্যে মনুষ্যদিগকে নিয়োজিত করিয়া থাকে। দুঃখ এক জাতীয় নহে। আমাদের জীবনটাই দুঃখময়, যে স্থানে বসতি তাহাও দুঃখে পরিপূর্ণ, যাহাদের সহিত বাস করা যায়, তাহারাও দুঃখাধারবিশেষ। মনুষ্যদিগের দুঃখ অপার, অনন্ত এবং বচনাতীত বিষয়। মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ সম্রাজ্যের দুঃখকাহিনী বলিতে গেলে বেদব্যাসের অবতরণ হওয়া আবশ্যক। সে যাহা হউক, মনুষ্যেরা দয়াপরবশে রুচি এবং শক্ত্যনুসারে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কেহ মানসিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয় লইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন, কেহ শারীরিক স্বচ্ছন্দতা সংরক্ষণ এবং সম্বর্দ্ধনের জন্য প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন, কেহ অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নিবারণের উপায়স্বরূপ জীবিকানির্ব্বাহের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। কেহ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া, কাহাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া, রোগীর রোগযন্ত্রণা বিমুক্ত করিয়া, কন্যা-ভারের অংশ লইয়া, ঋণীর ঋণ শোধ করিয়া, মুটের মোট তুলিয়া দিয়া, দয়ার কার্য্য করেন। কার্য্যবিশেষ লইয়া যদ্যপি আমরা তুলনা করিতে যাই, তাহা হইলে বিষম অসামঞ্জস্য ভাব উপস্থিত হইবে। কিন্তু স্থূল কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণ করিয়া দেখিলে সর্ব্বস্থলে এক দয়া—এক অদ্বিতীয় দয়াকে—বিরাজ করিতে দেখা যায়।

মনুষ্যদিগকে লইয়া এইরূপে বৈশ্লেষিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আলোচনা করিলে প্রত্যেক ভাব সম্বন্ধে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানলাভ করা যায় এবং সেই ভাবের কার্য্য ব্যক্তিবিশেষে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

মানসিক সাধারণবৃত্তিপরম্পরা বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলে অতি অদ্ভুত কপাট উদ্ঘাটন হইয়া যায়। ধর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। ভগবানকে অনন্ত ব্যক্তি অনন্ত ভাবে উপলব্ধি করেন। যাঁহার যে প্রকার ধারণা, যাঁহার যে প্রকার দর্শন, যাঁহার যে প্রকার শিক্ষা, ভগবান সম্বন্ধে তাঁহার সেই প্রকার জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। অবস্থাবিশেষে, সামর্থবিশেষে এবং সময়বিশেষে লোকে আহার করিতে বাধ্য হয়। যাহার দুই পয়সা ব্যয় করা সাধ্যাতীত, সে কেমন করিয়া চর্ব্যচূষ্য-

লেহ্যপেয় সংগ্রহপূর্ব্বক রসনায় পরিতৃপ্তি করিতে পারিবে? ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্মজ্ঞানও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যদিগের ধারণা অদ্ভুত ব্যাপার, একটী প্রসঙ্গ লইয়া বিচার করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কেহ লুচি, কেহ রুটী, কেহ পরটা খাইতে ভালবাসেন, কিন্তু ময়দা ও ঘৃত এক পদার্থ। ঠাকুর বলিতেন, কেহ মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ী, মাছ ভাতে, মাছের কাবাব, মাছের কালিয়া বা পোলাও অথবা মাছ পোড়া, খাইতে ভালবাসে। সর্ব্বত্রে মাছ এক পদার্থ। ধর্ম্মবিষয়টীও ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকার দেখা যায়।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পিপাসান্বিত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া জলাশয় হইতে অঞ্জলী পূরিয়া জলপান করিতে কখনই ইতস্ততঃ করিবে না, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পথশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে কীটকণ্টকাদিসঙ্কুল স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতে ভীত হইবে না, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি বিকৃত মৎস্য ভোজন করিতে সন্দিহান হইবে না, কিন্তু যিনি পণ্ডিত, যিনি শরীর পালন ও সংরক্ষণ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি জলের উত্তমাধমতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি স্থানিক কারণবিশেষে ব্যাধির উৎপত্তিবিষয়ক বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যিনি মৎস্যমাংসবিকৃতিজনিত বিশেষ প্রকার বিষের (Ptomane), উদ্ভাবন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কখন নিরক্ষর ব্যক্তির ন্যায় অবাধে যে কোন জলাশয়ের জল পান, যথা ইচ্ছায় শয়ন এবং যে কোন মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেন না। ফলে, যে ব্যক্তি যে প্রকার সংস্কার-প্রস্ত হইয়াছেন, যিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, যিনি যেরূপ ভাবে মন সংগঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই সংস্কার, সেই ভাব, সেই শিক্ষা অতিক্রম করিয়া কিরূপে কার্য্য করিবেন? এই নিমিত্ত ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রকার ধারণা হইয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষে স্বতন্ত্র ধারণা হইলে তাহার ইতরবিশেষ করিবার কাহার শক্তি নাই। কারণ, যে বস্তু লইয়া ধারণা তাহা সর্ব্বত্রে এক অদ্বিতীয় এবং পাত্রবিশেষে তাহার কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার হওয়া বিশ্বমণ্ডলের সাধারণ লক্ষণ, তাহা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতেছে যে, যাহার যে বিষয়ে যেরূপ ধারণা তাহা সর্ব্বত্রে অভ্রান্ত বলিবার হেতু কি? নিরক্ষর ব্যক্তি জলের উত্তমাধমতা বিষয়ে অজ্ঞান বলিয়া যাহা ইচ্ছা পান করে, কিন্তু তাহা বলিয়া সেই

অজ্ঞানকে কি অভ্রান্ত বলা যাইবে? বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা কখন বলিতে দিবেন না। ধর্ম্ম জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই প্রকার। অজ্ঞানতাবশতঃ মনুষ্যেরা অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, মনুষ্যকে ভগবান বলিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন, এ প্রকার অজ্ঞানপ্রসূত কার্য্যকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বিশুদ্ধ বিচার এবং কার্য্যক্ষেত্রপ্রসূত জ্ঞান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন বলিয়া প্রভু অদ্বৈতজ্ঞান লাভপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্র দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। মানসিক কল্পনায় যাহা স্থির করা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মানসে আকাশ কুসুম ফুটাইয়া তাহার মালা গাঁথিয়া পুষ্পশয্যা রচনা করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যে তাহা সমাধা করা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল কারণ নিরূপণপূর্ব্বক পানীয় জলের যোগ্যা-যোগ্যতা বিষয় সিদ্ধান্ত করেন, সেই সকল কারণ সত্ত্বেও কোন স্থলে কোন প্রকার ব্যাধির উত্তেজনা হয় এবং কোথাও হয় না। বিসূচিকার বিষ অতি প্রবল, তাহা আমরা দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, জলের দ্বারা ঐ বিষ শরীরে প্রবেশ করে। এই নিমিত্ত বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর মল-মূত্র জলে নিক্ষেপ করিলে রাজদণ্ডার্হ হইতে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই আনুমানিক মীমাংসায় বিপরীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন পরিবার মধ্যে কাহারও বিসূচিকা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে পলায়ন করে না। সন্তানের রোগ হইলে মাতা দক্ষিণ হস্তে মলাদি পরিষ্কার করেন, স্বামীর পীড়া হইলে স্ত্রী স্বহস্তে সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। যদ্যপি মরিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদেরই অগ্রে মরা উচিত, কিন্তু কোথায় সে ঘটনা? যাহারা মরিবার তাহারাই মরে। বিশেষ সুপণ্ডিত যাঁহারা, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধাতাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারাই যখন বিসূচিকাদি রোগে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন বিজ্ঞান শিক্ষা করা এবং না করায় কি সমান ফল নহে। নিরক্ষর ব্যক্তি না জানিয়া জলের সহিত বিসূচিকা-বিষ পান করিল, সুপণ্ডিত সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়াও সতর্কতাপূর্ণ হৃদয়ে আহা-রাদি করিয়া বিসূচিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না, এই কার্য্যক্ষেত্র দেখিলে কি মীমাংসা করা যাইবে? কার্য্যক্ষেত্রে সকলেরই এক দশা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশমতে বিচার করিয়া দেখিলে

এই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মের নিগূঢ় বিজ্ঞান জ্ঞাত হইয়াই হউক, অথবা তাহা না জানিয়াই হউক, কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে সমান ফললাভ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মভাব যে স্থানে যে ভাবেই প্রস্ফুটিত হউক, তাহার কার্য্য একই প্রকার। যেমন, পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা সর্ব্বব্যক্তির একই ভাব, একই কার্য্য। ভগবান সম্বন্ধে, যদ্যপি বাস্তবিক ভগবানের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে সকলেরই এক প্রকার ভাব এবং এক প্রকার কার্য্য হইবেই হইবে, তদ্বিষয়ে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

এই প্রশ্নটী মীমাংসা করিতে হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস কি, তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। ভগবানের দুইটী ভাব সকলেই বিশ্বাস করেন। যথা, নিত্য এবং লীলা, অথবা অপ্রকাশ এবং প্রকাশ ভাব। নিত্য বা অপ্রকাশ ভাব সমর্থনকারীরা আমাদের বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখিত। বৈদান্তিক মতে প্রকাশ বা লীলাভাব অলীক এবং মিথ্যা, সুতরাং, তাহা গ্রাহ্যনীয় নহে। এই ভাবের ভাবুকেরা আপনাকে ভগবান মনে করেন এবং তাহাই সকলকে মনে করিতে বলেন। ভগবানের পাপ পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, কর্ম্মাকর্ম্ম নাই। দ্বিতীয় মতে ভগবান এবং ভক্ত জ্ঞান থাকে। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মাকর্ম্ম বোধ বিলক্ষণ থাকে। এই ক্ষেত্রে ভগবান লীলারূপধারী বলিয়া ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ ভগবান হওয়া এবং ভগবানকে পাওয়া দুইটী মতের সংক্ষিপ্ত ভাব। এই উভয় ভাবের তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখিলে বিশেষ তারতম্য আছে বলিয়া বোধ হইবে না। ভগবান হইয়া যাওয়ায়, তথায় ভগবান ও ভক্তের স্বাতন্ত্র থাকে না, এবং ভগবান প্রাপ্ত হওয়া পক্ষেও ভগবান এবং ভক্তে স্বাতন্ত্র থাকে না। যে ব্যক্তি ভগবানে বিলীন হন, তাঁহার স্থানে ভগবান কর্ত্তা, এই নিমিত্ত তিনিই ভগবান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং যে স্থানে ভগবান লাভ করা যায় সে স্থানেও ভগবান কর্ত্তারূপে বিরাজ করেন। তাঁহার নিজের কোন বলবুদ্ধি থাকেনা, ভক্তের নিজের কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকে না। এই মর্ম্মে প্রভু আমার বলিতেন যে, একদা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক প্রেম বিহার করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া পুলকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। এতক্ষণ যে মন নয়ন-পথ দ্বারা দর্শনসুখানুভব করিতেছিলেন, তাহা প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ায় আপন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রাণবল্লভকে লইয়াই ডুবিলেন।

তখন তাঁহারা আর আপনার ভাব সংরক্ষা করিতে অসমর্থা হইয়া পড়িলেন। আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ক্রমে প্রাণ অধিকার করিয়া ফেলিলেন, তথন প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে করিতে কৃষ্ণভাবই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তাঁহারা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখিতে লাগিলেন। দেখেন আপনিই কৃষ্ণ। তখন কোন সখী আপনার বক্ষাচ্ছাদিত উত্তরীয় বস্ত্রাগ্রভাগ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ! দেখ! তোমরা সকলে চাহিয়া দেখ! আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রকোপ হইতে তোমাদের গোকুলে রক্ষা করিলাম।" কোন সখী অপর সখীর বেণীর অগ্রভাগ বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক সদর্পে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁরে পামর! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! তুই আমার সর্ব্বস্বধন নিরীহ রাখাল বালকগণের জীবন নাশ করিয়াছিলি? এখন তোকে কে রক্ষা করিবে?" এইরূপে প্রত্যেক সখী প্রেমোন্মাদিনী হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত চিন্তার ফলে উন্মত্ততা আইসে, তাহা আমরা জানি এবং এই অবস্থায় সত্য সম্বন্ধ থাকিলে তাহার সত্য ফলই লাভ হয়। আর্কিমিডিজের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে অতি চিন্তায় সাধারণ বাতুলতা আসিতে পারে না বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। সে যাহা হউক, লীলাভাবেও তন্ময়ত্ত হওয়া যায়। অতএব দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবের পরিণাম একই প্রকার কিন্তু কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা স্থূলে এই কার্য্যপ্রণালীর সহিত উদ্দেশ্য মিলাইতে যাইয়া বিভ্রাটে নিপতিত হইয়া থাকি। উদ্দেশ্য বা ভাব এবং কার্য্যপ্রণালী বা স্থূল আচরণাদির তাৎপর্য্য জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব অগ্রে অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিতে বলিয়াছেন।

রামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞানুসারে মনুষ্যজীবন বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা কি বুঝিলাম? পুনরায় তাহা সংক্ষেপে দেখা হউক। আমরা বুঝিয়াছি যে, মনুষ্য জাতি বলিলে এক প্রকার পদার্থ ও ভাবাদি সম্মিলনসম্ভূত পদার্থ বুঝায়। হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ, চীন, রুষ, তাতার, কাফ্রি প্রভৃতি সভ্য অসভ্য, নরনারী, ধনী, নির্ধনী, জ্ঞানী মূর্খ সকলেই এক প্রকার। এক্ষণে ধর্ম্ম বৃত্তটি লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদ্যপি অন্যান্য বৃত্তিগুলির এক অদ্বিতীয় ভাবে থাকিয়া কার্য্যের অসমতা প্রকাশ করা ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবৃত্তিটীও সেইরূপ সর্ব্বত্রে এক বলিয়া স্বীকার না করিবার

কোন হেতু নাই। এক জন ক্ষুধায় সন্দেশ খাইতেছে, আর এক জন কলা খাইয়া জঠরানল নিবারণ করিতেছে। যে ব্যক্তি কলা ভক্ষণ করিতেছে, সে সন্দেশ না খাইলে কি তাহার ক্ষুধা স্বীকার করিব না? আহার করা ক্ষুধার পরিচায়ক, সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্মভাবের নির্দ্দেশকস্বরূপ। এস্থানে অদ্বৈত জ্ঞান ধর্ম্ম এবং তাই আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ যে কোন প্রক্রিয়া, সাধন বা ভজন দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর, ইহাই প্রভু রামকৃষ্ণের অভিপ্রায়। এইরূপে সকল নরনারীর ধর্ম্মবৃত্তি এক অদ্বিতীয় এবং তাহার কার্য্য বহুভাবব্যঞ্জক বলিয়া চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মিলে পরস্পর সমতা সংস্থাপনের কি আর বিলম্ব হইতে পারে। সর্ব্বত্রে ধর্ম্ম এক কিন্তু তাহার কার্য্য বহু; ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কহা যায়।

রামকৃষ্ণদেব যে কেবল এইরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা নহে। আপনি নিজে কার্য্য করিয়া যাহা দর্শন করিতেন, তাহাই সাধারণকে উপদেশ দিতেন। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর," এই উপদেশটীও তাহার নিজের প্রত্যক্ষ সাধনের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, পুষ্পমাল্যে নানাবিধ ফুল সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু অন্তরে অদ্বিতীয় আমি সূত্রবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকি। এই কথার তাৎপর্য্য যাহা, রামকৃষ্ণদেব তাহাই অভিনয় করিয়াছেন। কেবল কথায় কার্য্য হয় না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কথায়ই সর্ব্বত্রে সমতা হইয়া যাইত। পরিতাপ সাধারণ নহে যে, হিন্দুর পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ, হিন্দুশাস্ত্র গীতা, হিন্দু হইয়া তাহা প্রতিপালন করিতে চাহেন না। বৈদান্তিক একেশ্বরবাদীরা অবতার অস্বীকারই করেন, সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের কথায় ফল হইবে কিরূপে? এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণ কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, কার্য্যে কোন বিষয় না দেখাইলে লোকের মনে কখন ধারণা হইতে পারে না। এই কারণে তিনি বৈদান্তিক একদেশীমত অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন করিয়াছিলেন। সাধন দ্বারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সিদ্ধান্তপূর্ব্বক সে অবস্থাটী এইরূপে প্রকাশ করিলেন। যেমন, পারার হ্রদে সীসার চাপ ফেলিয়া দিলে সীসা পারা এক হইয়া যায়, সীসা স্বতন্ত্র থাকে না, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে জীবের তদ্রূপাবস্থা হয়। অথবা, নুনের ছবি সমুদ্রের জল নিরূপণ করিতে জলমগ্ন হইলে কিয়ৎকালমধ্যে গলিয়া যায়। এই দুইটী

দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈতবিজ্ঞানের প্রকৃতাবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বৈত-বিজ্ঞানের সাধকের স্বাতন্ত্র থাকে না। সাধক এবং সচ্চিদানন্দ একাকার হইয়া যান। সচ্চিদানন্দ পারা বা সমুদ্রবৎ, সাধক সীসা বা লবণের পুত্তলিকাবিশেষ। যাঁহারা বৈদান্তিক মতকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলেন এবং প্রত্যেক নরনারীর এই অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না। কারণ, বিশ্ববিধাতার অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডকারখানা জীবের দ্বৈব ভাব ধারণ করিতে কখন সমর্থ হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবের পক্ষে অদ্বৈত-জ্ঞান সম্ভবে, কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানী হওয়া যারপরনাই অসম্ভব কথা। সশরীরে সচ্চিদানন্দে বিলীন হওয়া মুখের কথা নহে। সত্যযুগে এই সাধনের ফলপ্রত্যাশার আর্য্যেরা সহস্র সহস্র বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমের আশ্রয় লইয়া ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্বরচনার নিগূঢ় রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেন। যখন ধ্যানে সিদ্ধ হইতেন, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল, সূক্ষ্ম কারণাদি উপলব্ধির শক্তি সঞ্চারিত হইত, তখন তাহাকে ধারণা কহা যাইত। মনের ধারণাশক্তি হইলে সে বিষয় আর বিস্মৃত হওয়া যায় না, সুতরাং, তাহা সর্ব্বদা মনের অধিকারভুক্ত থাকে। এই ধ্যেয় বস্তু লইয়া মন যখন বিভোর হইয়া পড়ে, তখন অন্যত্রে মনের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহাকে সমাধি কহে। সমাধি যোগীর অবস্থাবিশেষ। সমাধি না হইলে সচ্চিদানন্দের আভাস প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। রামকৃষ্ণদেব তোতাপুরীর নিকট অদ্বৈত মতের দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সাধন কার্য্যে নিমগ্ন হন এবং তাঁহার সৃষ্টিছাড়া শক্তিবলে তিন দিনে সমাধি লাভ করেন। তাঁহার বাস্তবিক যে সমাধি হইয়াছিল, তাহা ন্যাংটা তোতাপুরী নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে, সমাধি লাভ করিতে আমার ৪০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, উনি তিন দিনে কিরূপে সেই অবস্থা লাভ করিলেন? তিনি এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট এগার মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ গ্রাহ্য। যেহেতু, তিনি সাধক হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস না করিয়া আনুমানিক সিদ্ধ ব্যক্তির কথা কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না।

রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত বিজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বন্ধনপূর্ব্বক দ্বৈত বা লীলার বৃত্তান্ত অবগত হইবার আয়োজন করেন।

স্থুল জগতে প্রত্যেক বস্তু স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেক বস্তুর কার্য্য স্বতন্ত্র বিধায়, স্বভাবতঃ সকলের মনে পার্থক্য বোধ হয়। আমি অমুক, তুমি অমুক, সে অমুক, ইত্যাকার ভাবের কার্য্য হওয়া অনিবার্য্য। এইরূপ কার্য্যে আত্মাভিমান আইসে। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্ত অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বিশ্বজননী মহাকালীর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে সরোদনে বলিতেন, "মাগো! আমার অভিমান চূর্ণ করিয়া দে মা! আমি দীনের দীন. হীনের হীন, কীটানুকীটাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম জ্ঞান জন্মাইয়া দে মা! আমি ব্রাহ্মণতনয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ঈশ্বরানুরাগী। এই অভিমান আসিয়া যেন আমার হৃদয়ভূমি অধিকার করিতে না পারে।" অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার অঞ্চলে বাঁধাছিল, অদ্বৈত জ্ঞানে কোথায় কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, তাহার অভিনয় আরম্ভ হইল। তিনি সর্ব্বজীবকে জীব হিসাবে এক বলিয়া বোধ করিলেন।

একদিন মেতরকে দেখিয়া পূর্ব্বসংস্কার হেতু তাহাকে নীচ জাতি বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মা! মা! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে শতধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "মা! অদ্যাপি আমার অভিমান যায় নাই, অদ্যাপি আমার ভালমন্দ জ্ঞান যায় নাই। সর্ব্বজীবে আমার সমজ্ঞান হওয়া দূরে থাক, এক মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ মেতরের পার্থক্য ভাব অদ্যাপি রহিয়াছে। তবে আমার উপায় হইবে কি?" তিনি বুঝিলেন যে, কার্য্য ব্যতীত ফল ফলে না। কেবল আনুমানিক বিচারের দ্বারা কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বুঝিলেন যে, বেল কাঁটাকে না ভস্মীভূত করিলে তাহার বিদ্ধকরণ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না। নিকটে বেলকাঁটা রাখিয়া নয়ন মুদিয়া মনে মনে দগ্ধ করিলে উহা কখন বিনষ্ট হয় না। বাস্তবিক কার্য্য চাই, বাস্তবিক অগ্নির দ্বারা বেল কাঁটাকে দগ্ধ করিতে হইবে তাহা হইলে উহার দ্বারা আর শরীর বিদ্ধ হওনজনিত ক্লেশানুভব করিতে হইবে না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পরদিবস অতি প্রত্যূষে পাইখানায় যাইয়া, হস্তে নহে, মুখে সম্মার্জ্জনী লইয়া উহা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সাধন দ্বারা, মানবজাতি কেবল কার্য্যের দ্বারা পরস্পর পৃথক জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে বলিয়া বুঝিলেন। যিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন, যিনি সাধন ভজন করেন, যিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, তিনি তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। যিনি ধনী, তিনি

দুঃখীকে অবজ্ঞা করেন, যিনি বলিষ্ট তিনি দুর্ব্বলের শাসন করেন। ফলে, কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং কার্য্যই সকলের সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ। কার্য্যেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কার্য্যেই মূর্খাধম কৃষক, কার্য্যেই একব্যক্তি মেথর, কার্য্যেই মেথর সর্ব্বজনসম্মানিত অতি উচ্চ পদ অধিকার করেন। অতএব কার্য্য ছাড়িয়া দিলে সকলেই এক মনুষ্যজাতি। আজ কার্য্যসূত্রে এক ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর, কাল কার্য্যসূত্রে তিনি পথের কাঙ্গাল। স্থলে কার্য্যই অতি প্রবল। অতঃপর রামকৃষ্ণদেব স্ত্রীজাতি লইয়া বিচার করেন। স্ত্রীজাতি এক অদ্বিতীয়, কেবল কার্য্যভেদে পার্থক্য জ্ঞান জন্মায়। কার্য্যেই স্ত্রীলোক মহারাণী, কার্য্যেই স্ত্রীলোক পথের কাঙ্গালিনী, কার্য্যেই স্ত্রীলোক গৃহস্থের বধু সতী সাবিত্রী, কার্য্যেই স্ত্রীলোক বারাঙ্গনা বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকেন। অঙ্কলস্থিত অদ্বৈতজ্ঞানের ফলে তাঁহার সর্ব্বত্রে মাতৃ-ভাব জন্মিয়া যায়। তাই তিনি বলিতেন যে "স্ত্রীজাতিমাত্রেই আমার মা। আমার মা আনন্দময়ী কখন ঘোমটা দিয়া গৃহস্থের বধু হইয়া থাকেন। আবার কখন দেখি মেছুয়াবাজারের বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে করিয়া খানকি সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।" নরনারীসম্বন্ধে এবম্বিধ অদ্বৈত এবং দ্বৈতজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াও তিনি নিরস্ত হন নাই। কেবল বস্তুবিশেষে অদ্বৈতজ্ঞান কখন আবদ্ধ থাকে না ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত জ্ঞান। সুতরাং, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্, স্থাবর, জঙ্গম সমুদয় একাকার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্রে অদ্বিতীয় চৈতন্যশক্তি বিরাজিত দেখিয়া সকলের নিকটে মস্তকাবনত করিতেন। প্রত্যহ পিপীলিকা কীটপতঙ্গাদিদিগকে চিনি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন। এই কার্য্যে কখন কখন তাঁহার দুইটা তিনটা বাজিয়া যাইত। ভোজন করিতে করিতে নিকটে কুক্কুরাদি কোন জন্তু দেখিলে অমনি ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন। রাত্রিকালে শৃগাল সকল আসিয়া আহার করিয়া যাইত। উদ্ভিদাদিতে চৈতন্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় আর তিনি পুষ্পচয়ন করিতে পারিতেন না। তৃণাদি পদদলিত হইবার আশঙ্কায় অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতেন। অসাবধানপ্রযুক্ত যদ্যপি কখন তৃণ মাড়াইতেন, তাহা হইলে তিনি কাঁদিয়া অস্থির হইতেন। তৃণের গাত্রে হাত বুলাইয়া দিতেন, তাহাতে জল ঢালিয়া তাহার বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। জড়পদার্থ বিচারকালে তিনি টাকা এবং মাটির সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে টাকা মাটিতে প্রভেদ অসীম। একটি টাকা এবং উহার ওজনের মাটির মূল্য এক নহে। তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের

বিরূপে তাহা একশক্তিপ্রসূত বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। টাকা মাটি স্থূলে এক নহে কিন্তু উহাদের উৎপত্তিক কারণ বিচার করিলে উহাদের এক বলিতে বাধ্য হইতে হয়। পদার্থবিজ্ঞান মতে স্থূলে পদার্থদিগের নানাবিধ ভাব, নানাবিধ ধর্ম্ম এবং নানাবিধ কার্য্য দেখা যায়,তাহাদের কারণাদি বিচার করিলে শক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ, পদার্থদিগের অবস্থান্তরাদি শক্তির অধিকারভুক্ত। শক্তি এবং পদার্থ বিভাগ করিতে যাইলে পদার্থ হারাইয়া যায়। যেমন, জল ও বাষ্প এক পদার্থ, উত্তাপশক্তির দ্বারা অবস্থান্তর হয় বলিয়া উল্লেখিত, কিন্তু পদার্থ এবং শক্তি উভয়ে এত জড়িত যে উহাদের কাহাকেই স্বতন্ত্র করা যায় না। এই নিমিত্ত কেহ পদার্থ এবং শক্তি স্বীকার করেন। কেহ কেবল শক্তি স্বীকার করেন। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বত্রে শক্তিকেই সকলের নিদান বুঝিয়া টাকা এবং মাটি এক শক্তির বিকাশ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি কেবল টাকা মাটির অদ্বৈতভাব নিরূপণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অদ্বৈতবিজ্ঞানীর চক্ষে বিষ্ঠাচন্দনও এক। প্রভু আবার তাহাও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি আপনার বিষ্ঠা লইয়া সাধন করেন। এই কার্য্য দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আপনার বিষ্ঠা স্পর্শ করিলে যদ্যপি অদ্বৈতজ্ঞানী হয়, তাহা হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তাহা বলা যাইবে না কেন?" ব্রাহ্মণের এই উপহাস রামকৃষ্ণদেব দৈববাণীবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি সাধারণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সাধ্যমত তিরস্কার করিতে যাইলেন না। তিনি আপনাআপনি বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ বাস্তবিক কথা বলিয়াছেন। তিনি পরদিবস অদ্বৈতজ্ঞানের মহারতায় গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক সদ্যত্যক্ত মল জিহ্বার দ্বারা বার বার স্পর্শ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদনন্তর রামকৃষ্ণদেব ভাবের খেলা আরম্ভ করেন। তিনি ধর্ম্মের বিবিধ ভাবের তাৎপর্য্য বাহির করিবার নিমিত্ত অতি সামান্য ব্রত,যথা গোকল,হইতে প্রায় সকল প্রকার ভাব লইয়া সাধন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবিজ্ঞান লাভ করিবার ন্যায় এই সকল সাধনের সময়ও তেমনি তিন দিনের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক ভাব সাধনের সময় সেই ভাবের একজন সিদ্ধ পুরুষ আসিতেন। এই রূপে তিনি পঞ্চবটী সংগঠিত করিয়া তথায় বেদবিহিত সাধন সমাপন করেন। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপনপূর্ব্বক তান্ত্রিক যাবতীয় সাধনা ব্রাহ্মণীর তত্ত্বাবধারণে পরি-

সমাপ্ত করেন। প্রভু বলিতেন যে, ব্রাহ্মণীর দ্বারা কর্ত্তাভজা, নবরসিক, পঞ্চ নামী প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনায় সহায়তা হইয়াছিল। শিখ, রামাৎ, নিমাৎআদি বিবিধ মত সাধনান্তে গোবিন্দ দাস নামক ব্যক্তির নিকটে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তিন দিবস সাধনান্তে তদ্ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি খ্রীষ্টভাবে অবস্থিতি করিয়া আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মটাও দেখিতে বাকী রাখেন নাই। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, "সখি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" অর্থাৎ, শিক্ষা না করিলে শিক্ষিত হওয়া যায় না এবং শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না। মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার শিক্ষার সময়। কিঞ্চিৎ শিক্ষার বিশেষ দোষ। তাহাতে মনুষ্যকে প্রবীণ করিয়া তুলে। প্রবীণ হইলেই সর্ব্বনাশ, তখন তাহাতে গুরু গিরি আইসে, তখন তিনি সকলকে শিক্ষা দিতে চাহেন, শিক্ষা করিতে তাহার আর স্পৃহা থাকে না। শিক্ষা করিতে থাকিলে আপনাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না; পদে পদে আপনার অজ্ঞতার ভাব উদ্দীপন থাকে বলিয়া অভিমান আসিতে পারে না।

রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সর্ব্বত্রে সমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বরের অনন্ত ভাব; অনন্ত ভাবের পরিচয় স্থূল জগতের অনন্ত প্রকার বস্তু, অনন্ত বস্তুর সমষ্টই ঈশ্বর। তিনি এই ভাবনীয় তাৎপর্য্যবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত বলিতেন যে, চন্দ্র সূর্য্য এক অদ্বিতীয়। মনুষ্য, জীব, জন্তু, জল, বায়ু, মৃত্তিকা, পাহাড়, পর্ব্বত, সকলেই এক সূর্য্য চন্দ্রের দ্বারা আপনআপন ভাবের কার্য্য করিয়া লইতেছে। উদ্ভিদেরা উদ্ভিদ্দিগের প্রয়োজনমত, জীবগণ তাহাদের প্রয়োজনমত কার্য্য করিতেছে। ইহারা পরস্পর কলহ করে না, ইহারা আপনভাবে সকলকে আকর্ষণ করিতে যায় না। যদ্যপি সেরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে উদ্ভিদ্ এবং জীবমণ্ডল এক মুহূর্ত্তকাল বাঁচিতে পারিত না। জীব এবং উদ্ভিদ্মণ্ডলের সমতারক্ষার কারণ নিরূপণ করিলে দেখা যায় যে,উহারা আপনাপন কার্য্যের দ্বারা পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে। যতক্ষণ উহারা আপন কার্য্য আপনি করে, ততক্ষণই সমতা রক্ষা হয়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে ধর্ম্মের সমতা স্থাপন করিলে আপনাপন ভাব রক্ষা ও প্রতিপালন করা বুঝায়। হিন্দুতে হিন্দুভাব, মুসলমানে মহম্মদীয় ভাব, খ্রীষ্টানে খ্রীষ্ট ভাব, এবং বৌদ্ধে বুদ্ধ ভাব অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে যে প্রকার ভাব উত্থিত হইবে, সেই ভাব তাহার নিজের বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সে ভাব অন্যের নহে। সে ভাবে অন্যকে আকর্ষণ করা সমতাস্থাপনের তাৎপর্য্য নহে। এই নিমিত্ত প্রভু আমায় বলিতেন, যেমন বাটীর কর্ত্তা এক অদ্বিতীয়, নানাবিধ ভাব তাঁহাতে আছে। তিনি পিতা, তিনিই পিতামহ, তিনিই মাতামহ, তিনিই সময়ে বৃদ্ধপিতামহ এবং মাতামহ, তিনিই স্বামী, তিনিই পুত্র, তিনিই দৌহিত্র, তিনিই শ্বশুর, তিনিই জামাতা, তিনিই সাধু, তিনিই অসাধু, তিনিই চোর, লম্পট, অর্থাৎ যত প্রকার ভাব সম্ভবে সমুদয় এক ব্যক্তিতে সম্ভবে। কিন্তু এই বিবিধ ভাবের কার্য্য এক স্থানে হয় না। বিবিধ ভাব বলিলে কার্য্যের পার্থক্য আসিতেছে। স্ত্রীর ভাব কন্যায় কিম্বা পুত্রবধুতে কার্য্য করে না। স্ত্রীর ভাব স্বতন্ত্র, কন্যার ভাব স্বতন্ত্র এবং পুত্রবধুর ভাব স্বতন্ত্র অর্থাৎ বাটীর কর্ত্তা মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রবৎ এবং পরীধির বিন্দুবৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। মধ্যে কর্ত্তা বসিয়া আছেন চারিদিকে পারিবারিক সম্বন্ধ বা ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক ভাব এক মধ্যস্থানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পারিবারিক সমতা হয়। অর্থাৎ পরিবারের প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ ভাব প্রতিপালন করিলে সমতা থাকিতে পারে। কিন্তু যদ্যপি তাহার ভাববিপর্য্যয় হয়, যদ্যপি স্ত্রী যাইয়া কন্যার স্থল বা ভাব অধিকার করে, তাহা হইলে কর্ত্তার সহিত ভাবান্তর উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, কর্ত্তার সহিত কন্যার বাৎসল্যভাবের সম্বন্ধ এবং স্ত্রীর সহিত মধুর ভাবের সম্বন্ধ। বাৎসল্যে মধুর যাইলে, সুতরাং ভাবের অসমতা উপস্থিত হয়। এইরূপে একজনের ধর্ম্মভাব অপরে অবলম্বন করিতে যাইলে ধর্ম্মের সমতা স্থাপন না হইয়া অসমতাই সংঘটন হইয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষীভূত পারিবারিক ছবির দ্বারা ধর্ম্মজগতের অবিকল সেইরূপ ছবি আপনি দেখাইয়া ভাবজগতের বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বত্রে সমতাস্থাপনের ভিত্তিভূমি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাটীর কর্ত্তা অর্থাৎ কেন্দ্রবিশেষরূপে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মজগতের যাবতীয় ভাবকে পরিধির বিন্দুবিশেষ অথবা পারিবারিক ভাববিশেষরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে বৈদান্তিক পরমহংসেরা তাঁহার মুখারবিন্দবিনিসৃত উপদেশ-সুধাপান করিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণচিত্তে চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। পরমহংসেরাই তাঁহার পরমহংস উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে স্থানে যত পরমহংস ছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে সকলেই দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরাও দেখিয়াছি। পরমহংসেরা

রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহাদের শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিতেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক উদাসীন, যথা, নানক, রামাৎ, গরীবদাসী, শঙ্কর প্রভৃতি সম্প্রদায় ভুক্ত সাধুগণ এপ্রদেশে আসিলে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করিয়া যাইতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন সম্প্রদায়ের ভাবুক বলিয়া আনন্দ লাভ করিতেন এবং যাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত, রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার তাহা পূর্ণ হইয়া যাইত। একদা তিন জন উদাসীন সাধু আসিয়াছিলেন। এই সাধুত্রয়ের মধ্যে এক জন প্রবীণ এবং বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জলপাইগুড়িতে রামকৃষ্ণদেবের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে আগমন করেন। যে দিন তাঁহারা প্রভুর সন্নিহিত হন, এ দাস তথায় উপস্থিত ছিল। রামকৃষ্ণদেবের কোন ধর্ম্মের ভেক ছিল না ; তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় লালপেড়ে কাপড় পরিধান করিতেন। সাধুরা উপস্থিত হইয়াই প্রভুকে চিনিতে পারিলেন এবং নারায়ণ বলিয়া মস্তকাবনতপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ ভাবের আলাপন হইবার পর পণ্ডিত সাধুটী নানাপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সত্ত্ব গুণের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দেখ কোন সময়ে এক গৃহস্থের বাড়ীতে তিন জন চোর প্রবেশ করিয়াছিল। চোরেরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বাটীর কর্ত্তার হস্তপদাদি এবং চক্ষু পর্য্যন্ত উত্তমরূপে বন্ধনপূর্ব্বক নিবিড় বনে তাহাকে লইয়া গেল। তদনন্তর এক জন চোর কহিল যে, আর বিলম্ব কেন, উহার গলদেশ সঞ্চাপিত করিয়া প্রাণসংহার করিলেই আমাদের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়।" দ্বিতীয় চোর কহিল, "উহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং হস্তপদাদিও বন্ধন করিয়া বনে আনিয়াছি, শাস্তির আর অবশিষ্ট কি আছে? উহার প্রাণসংহার না করিয়া বন্ধনাবস্থায় পরিত্যাগ করা যাক, বন্যজন্তুগণ আসিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।" তৃতীয় চোর কহিল যে, "আমার বিবেচনায় উহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত।" নিরাশ্রয় ব্যক্তি তৃতীয় চোরের শরণাপন্ন হইয়া সকাতরে কহিল, "মহাশয়! দয়া প্রকাশ করিয়া বন্ধনমুক্ত করিলেন, কিন্তু আমাকে পথ দেখাইয়া না দিলে কিরূপে বাটীতে ফিরিয়া যাইব? কোন্ পথ দিয়া আনিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।" তৃতীয় চোর উহাকে সদ্ভিব্যাহারে লইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া কহিল, "ঐ তোমার বাটী, স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আমি তোমার বাটী পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিব না।" এই তিন চোর

তিনটী গুণস্বরূপ। তম প্রাণে মারিতে চাহে, রজঃ বন্ধনাবস্থায় রাখিতে চাহে, এবং সত্ব বন্ধন খুলিয়া বাটী দেখাইয়া দেয়। সেও চোর, সুতরাং বাটী পর্য্যন্ত গমন করিবার তাহার অধিকার নাই। যে স্থানে সত্বের গতি রোধ হয়, সেই স্থান হইতে বাটী পর্য্যন্তকে শুদ্ধসত্ব কহে। ত্রিগুণ সত্বে কাহারও ব্রহ্ম লাভ হয় না; গুণাতীত বা শুদ্ধ সত্বাবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলে কেবল পথের ইতরবিশেষ ব্যতীত বাড়ী যাওয়া হয় না।" সাধুরা এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রায় বৃদ্ধকালে পতিত হইয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু একথা কোথাও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সত্বগুণী হইলেই কার্য্য মিটিয়া যায়। তাহার পর যে কার্য্য থাকে, তাহা তাঁহারা নূতন শুনিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা নবজীবন লাভ করিলেন বলিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তন্ত্রের সাধকেরা রামকৃষ্ণদেবকে কৌল বলিয়া জানিতেন এবং কিছুদিন প্রত্যেক শনিবারে চক্র হইত। এ প্রদেশের অচলানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক মহাশয়েরা প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।

শৈবমতের উপাসকেরা সময়ে সময়ে আসিতেন, তন্মধ্যে ইঁদেশের গৌরির নাম আমরা শুনিয়াছি। ইনি দীর্ঘকাল ঠাকুরের নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নবরসিক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবচরণ তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ প্রভুকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং এই সম্বন্ধে তিনি এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে গ্রন্থ খানির অদ্যাপিও কোন সন্ধান করিতে পারি নাই।

রামকৃষ্ণদেব একবার ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; তথায় শিখ রেজিমেন্টে কতিপয় শিখ ভক্ত ছিল। তাহারা প্রভুকে নানক সাহেব বলিয়া জানিতেন। শিখেরা তিন দিন প্রভুর সেবা করিবে বলিয়া অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি লইয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব ক্যান্টনমেন্টে তিন দিন শিখদিগের সহিত আনন্দ করিয়াছিলেন। নেপালের প্রতিনিধি মেজর বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এক জন নেপালী ব্রাহ্মণ।* তিনি সপরিবারে প্রভুর ক্রীতদাসের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ প্রভুকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাহার এক পরমাণু শ্রদ্ধা ভক্তি আমরা পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। বিশ্বনাথের স্ত্রী আপনি শুদ্ধাচারের সহিত প্রভুর জন্য পাক করিতেন এবং তিনি আপনিই ভোজন করাইয়া দিতেন। ভোজনান্তে প্রেমিক দম্পতি প্রভুর পদসেবা

করিয়া মানবজীবন চরিতার্থ করিতেন। ঠাকুরের শৌচ প্রস্রাব ত্যাগের জন্য ত্রিতল গৃহের ছাদের উপরে তাঁবু খাটাইয়া রাখিতেন। এপ্রকার ভক্তির কার্য্য আমাদের দেশের লোকেরা আপনার ইষ্টদেবের প্রতিও কখন কেহ দেখাইতে জানে না।

বৈষ্ণবচূড়ামণি বঙ্গের গৌরব কালনার ভগবানদাস বাবাজীর সহিত এক-বার প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ভগবানদাস বাবাজীর বয়স স্থির করিয়া কেহ বলিতে পারিতেন না। শত বর্ষের অধিক বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। রামকৃষ্ণদেব বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আজ কোন্ মহাপুরুষ অধীনকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন? আমার শরীর কেমন করিতেছে।" বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহার সমক্ষে আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ভগবান, অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ দেখিয়া প্রভু! প্রভু! বলিয়া চরণপ্রান্তে নিপতিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে জানিতে পারিয়া তাঁহার পূর্ব্ববিরুদ্ধভাবজনিত অপরাধের নিমিত্ত বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বে কলুটোলার চৈতন্যসভায় রামকৃষ্ণদেব গমনপূর্ব্বক সভার চৈতন্যাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভগবানদাস বাবাজী এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণের প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে দিবস গৌরাঙ্গসুন্দরের মহাভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব জ্ঞানপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ঠাকুরকে আপনাদের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমি এমন অনেককে জানি। আমাদের প্রসিদ্ধ ডাং সরকারের পুত্র অমৃতলাল একদিন এ দাসের বাটীতে প্রভুর পদধূলি পতিত হইবে শুনিয়া জনৈক মুসল-মান ডাক্তারকেসমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন। প্রভুকে দেখিয়া ডাক্তারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। প্রভুর চরণস্পর্শ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত হই লেও লোকলজ্জা আসিয়া প্রতিবন্ধক জন্মায়। পরে প্রাঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনের সময় প্রভুর প্রসাদ পাইয়া দুই হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক আপনভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করেন এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক হইল বলিয়া পরমানন্দে অমৃতকে প্রাণ্প ভরিয়া ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

উইলেম, পি, ডিমিশির খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তবিশেষ। উইলেম প্রোটে-ষ্টাণ্ট চার্চসম্ভূত খ্রীষ্টান। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুই পুরুষে খ্রীষ্টান। প্রকৃত সাহেব বলিলে অতিরঞ্জিত হয় না। তাঁহার প্রাণটা খ্রীষ্ট দর্শনের জন্য

অতিশয় ব্যাকুলিত হয়। কিন্তু দেখায় কে ? উইলেম প্রভুর নাম শুনিয়া কলিকাতায় আসেন। ভাল দিন দেখিয়া প্রভু দর্শন করিবেন এবং গুডফ্রাইডে নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। গুডফ্রাইডের দিনে বেলা দুইপ্রহরের সময় একজন স্থূলকায় সুদীর্ঘবিশালচক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ সাহেবীপরিচ্ছদেবিভূষিত একজন ব্যক্তিকে কেদার বাবুর সহিত আসিতে দেখিয়া আমরা উইলেম বলিয়া বুঝিলাম এবং অতি দ্রুতপদে প্রভুকে যাইয়া জ্ঞাপন করিলাম। প্রভু উইলেমের নাম শ্রবণমাত্রে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উইলেমের নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। উইলেম নগ্নপদে মস্তকবনত করিয়া বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভু নিকটে আসিবামাত্র অমনি চরণচুম্বণপূর্ব্বক নয়নবারির দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া দিলেন। সে দিনের কাহিনী কি বলিব। যাহা কখন শুনি নাই, যাহা কখন দেখি নাই, যাহা কেহ শুনে নাই, দেখে নাই, ভাবরাজ্যের অমিয় প্রেমের খেলার কি অদ্ভুত রহস্য, তাহাও দর্শন করিলাম। প্রভু আমার উইলেমকে লইয়া ভাবে বিভোর এবং তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপন গৃহে লইয়া যাইয়া সম্মুখে উপবেশন করাইলেন। উইলেম কোন কথা কহিলেন না। কেবল কৃতাঞ্জলীপুটে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু তাহাকে দুইদিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন। তদন্তর উইলেম প্রভুকেই খ্রীষ্টরূপে দর্শন করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশের নিভৃত গিরিগুহাবাসী হইয়া যাইলেন।

হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মসাম্প্রদায়ের সমুদয় নরনারী রামকৃষ্ণদেবকে আপনাপন ধর্ম্মের দেবতা বা ভগবান বলিয়া বুঝিতেন।

হিন্দুধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মেরাও রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহাদের অভিলষিত, তাঁহাদের ধারণাসঙ্গত, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ন্যায় মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর প্রতি তাঁহার সমধিক কৃপা ছিল। কেশব বাবু যখন আদিব্রাহ্ম সমাজে ছিলেন, তখন একদিন রামকৃষ্ণদেব তথায় গমন করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে মহর্ষি সমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করায়, প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি। কথাগুলি নিতান্ত কটু এবং তিনি কাহার মুখাপেক্ষা করিয়া কোন কথা বলিতেন না, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অতএব তাঁহার কথা উল্লেখ করায় যেন কেহ আমায় অপরাধী না করেন। আমি সত্য কথা বলিতে আসিয়াছি।

সত্য কথা গোপন অথবা সাধারণের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা বিকৃত করিয়া বলা আমার উচিত নহে। রামকৃষ্ণদেব কেশব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,"ঐ পাতলা সুন্দর যুবকটীর ফাত্‌না নড়িতেছে। অবশিষ্ট সকলে কেবল চক্ষু বুজাইয়া রহিয়াছে মাত্র। উহাদের দেখিয়া আমার একটি রহস্য মনে উদয় হইল। আমি দেখিয়াছি যে, দুপুর বেলা রৌদ্রের সময় বাঁদরগুলো ঝাউতলায় চক্ষু মুদিয়া যেন কত ভদ্রলোকের মত বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা বাস্তবিক চক্ষু বুজাইয়া বিশ্রাম করে না। তাহারা সেই সময় কাহার মাচায় শশা, কাহার গাছে পেয়ারা, অথবা কাহার চালে কুমড়া আছে, তাহাই চিন্তা করিয়া রাখে। একটু রৌদ্র কমিয়া যাইলে অমনি হুপ্ হাপ্ করিয়া গৃহস্থের বাটীতে উপদ্রব করিতে যায়। এই সকল উপাসকদিগের কপট ধ্যান ব্যতীত ঈশ্বরে মনের সংযোগ হয় নাই। কেবল বিষয় চিন্তা করিতেছে। সুতরাং, লোকের কাছে যে ভাবে পরিচিত হইতেছে, সে ভাব অন্তরের নহে। কেশব বাবুর ফাত্‌না নড়িতেছে, অর্থাৎ উহার প্রাণ কাঁটায় ভাবরূপ টোপ ঈশ্বর-মীন স্পর্শ করিতেছেন, তাহার মনরূপ ফাত্‌নার দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতেছে।"

কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব ১৮৭২ সালের ফাল্গুণ কি চৈত্র মাসের বেলা ৯টার সময় বেলঘরিয়ার বাগানে কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "তোমার লেজ খসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ হাঁসিয়া উঠেন। কেশব বাবু সকলকে নিরস্ত কারলেন। অতঃপর প্রভু কহিতে লাগিলেন যে, "ব্যাঙ্গাচি যখন জলে থাকে তখন তাহাদের লেজ থাকে। কিন্তু লেজ খসিয়া যাইলে, অমনি লাফাইয়া ড্যাঙ্গায় উঠে।" সেই দিনে রামকৃষ্ণদেবের সহিত কথোপকথনে কেশব বাবুর যে প্রকার অবস্থান্তর হয়, তাহা ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর তারিখের ইণ্টারপ্রিটার নামক পত্রিকায় উল্লিখিত আছে। যথা, "অনুমান একাদশ বৎসর অতীত হইল,একদিন প্রাতঃকালে বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশব বাবু এবং তাহার শিষ্যেরা স্নানাদি করিতেছিলেন,এমন সময় পরমহংসদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিয়দণ্ডের মধ্যে তাঁহাদের অন্তরে প্রেমের আলোক প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন,তাহা এতাবৎকাল সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং জ্ঞান হয় তাহা কেহ কালকবলিত হইলেও নির্ব্বাপিত হইবে না।"

কেশব বাবুর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসম্প্রদায় দ্বিখণ্ড হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে রামকৃষ্ণদেব তথায় যাইতে ছাড়েন নাই, এবং ব্রাহ্মসমাজনেতা শিবনাথ বাবু এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট গমন করিতেন। বলিতে কি, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে রামকৃষ্ণদেবের ভাবসম্বন্ধে প্রথমে চক্ষু ফুটাইয়া দেন। শিবনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, "পরমহংস মহাশয় যাহা বলেন, তাহাতে বিশেষ নূতনত্ব থাকুক, বা না থাকুক, কেন না কোন না কোন ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তবে ওঁর মহত্ব কোথায়? মা বলিয়া মাতৃহারা বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়ানই মহত্ব। ধর্ম্মের জন্য উনি যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন,এমন দৃষ্টান্ত দুই তিনটী স্থানে পাওয়া যায়। চৈতন্য-দেব যেমন অনুরাগে কেশোৎপাটন ও মুখঘর্ষন করিতেন, মহম্মদ গিরিকন্দরে বসিয়া থাকিতেন,কেহ নিকটে যাইলে তাহাকে ছেদন করিতে আসিতেন। ঈশা চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে ছিলেন, এঁর অবিকল সেইরূপ লক্ষণ দেখা গিয়াছে।" এক্ষণে আমরা বুঝিতে চাই যে, রামকৃষ্ণদেবকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকেরা কি ভাবে দেখিতেন? তাঁহারা সকলে কি আপনাপন পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণদেবের কল্পিত কোন নূতন ধর্ম্মের অনুগামী হইয়াছিলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি যে, যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যে ভাব, সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণকে সেই ভাবে দেখিয়াছেন। পরম-হংসেরা পরমহংস বলিতেন, কেন না, পরমহংস বলিলে ভগবানকেই বুঝায়। তান্ত্রিকেরা কৌল বলিতেন, কৌল বলিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়। তন্ত্রমতে শিবই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কালী উপাসকেরা রামকৃষ্ণকে কালী বলিয়া জানিতেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবুও রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহা-দের প্রতিষ্ঠিতা কালীর মানবলীলারূপ বলিয়া সচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যেদিন কালীর অন্নব্যঞ্জন নিবেদিত হইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেব ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন, সেইদিন মথুর বাবুর আনন্দের সীমা থাকিত না। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীমতি জ্ঞান করিতেন। সাধনকালে তিনি প্রথমে রাধার ভাবে পরিচ্ছাদাদি পরিধানপূর্ব্বক "কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া সমাধিস্থ হইতেন। মথুর বাবু এই সময়ে তাঁহার জন্য পেশোয়াজ কাঁচুলি ও নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, গঙ্গামাতা নাম্নী জনৈক পশ্চিমাঞ্চলের বৃদ্ধা সাধ্বী তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দুলালী! দুলালী!

(দুলালী শ্রীমতি রাধিকার নাম) বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে লইয়া সর্ব্বদা বৃন্দাবনের ব্রজ লীলা বিষয়ে আলাপ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রহস্য করিয়া বলিতেন, "তোমার কি এখন সে সকল কথা মনে হয়?" তিনি সর্ব্বদা সখি সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেন।

যে মুসলমান ডাক্তারের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি যদিও সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন, যদিও মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে হিন্দু হইতে, অথবা হরিনাম, কিম্বা কালী-নাম উচ্চারণ করিতে বলেন নাই। তিনি আপনভাবে অবস্থিতি করিয়াছেন। উইলিয়েম, পি, ডি, মিশির প্রভৃতি খৃষ্টানদিগকে খৃষ্টানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে একদিনও আজ্ঞা করেন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি খৃষ্টানই আছেন। রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তাঁহারা যে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একদা উইলিয়েমের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমি ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরীর নিকটে উপস্থিত হই। উইলিয়েম বাস্তবিক রামকৃষ্ণদেবের কৃপা পাইয়াছেন কিনা, জানিবার জন্য অতিশয় কুতুহল জন্মিল। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দেবীর সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলাম। উইলিয়েম একজন খৃষ্টান, খৃষ্টানেরা সাকার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া অবজ্ঞাসূচক ভাব ঘোষণা করেন। যে খ্রীষ্টানেরা হিন্দুর দেবদেবীকে যথা ইচ্ছা অবজ্ঞা করেন, হিন্দু জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয় দোষসঙ্কুল জ্ঞানে হিন্দু নরনারীর জাতি-কুল পরিত্যাগপূর্ব্বক খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যে ব্যক্তির পিতা এক সময়ে স্বইচ্ছায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্টান উইলিয়েম আনন্দময়ীর সমক্ষে আসিয়া মস্তকাবনতপূর্ব্বক সেলাম করিলেন। আমি আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমাদের মৃন্ময়ী দেবীকে সেলাম করিলেন কেন?" তিনি পরমপুলকে কহিলেন, "আমার খ্রীষ্টকে দর্শন করিলাম।" অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন যে, "ভাই! আর কি আমার পূর্ব্বভাব আছে। প্রভু রামকৃষ্ণ তৎসমুদয় চূর্ণ করিয়া নবচক্ষু দিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিতাম না, পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাইতাম না, এক্ষণে তাঁহার প্রসাদে দেখিতে পাই এবং বুঝিতে পারি। এখন সময়ে সময়ে মনে হয় যে, কত কুকর্ম্মই করিয়াছি। কি করিব, আমাদের শিক্ষাই ছিল দেবদেবী ঘৃণা করা। কিন্তু কি সৌভাগ্যে আমারা প্রভুর কৃপাকণা লাভ করিয়া নবজীবন পাইয়াছি।'

কেশব বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সতত নীরস ধর্ম্ম উপাসনা করিতেন, একথা এক সময়ে তাঁহার সম্প্রদায় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব কেশব বাবুকে শক্তি মানাইয়া, মা বলিয়া উপাসনা করিতে শিক্ষা দেন। তদবধি ব্রাহ্মসমাজে মাতৃভাবের উপাসনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮০৮ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় লিখিত আছে যে, "পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত আবদার করা, এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া ফেলে।" রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজের যে কি পর্য্যন্ত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইং ১৮৭৯ সালের থিষ্টিক কোয়াটার্লী রিভিউতে রামকৃষ্ণদেব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার সময় পাঠকের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার মানসে সর্ব্বাগ্রে, তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা চঞ্চল চিত্তে অথবা প্রবীণ ধীসম্পন্ন মূর্খের (Clever intellectual fool) ন্যায় কোন কথা বলিবেন না. যাহা বলিবেন, তাহা সজ্ঞানেই (deliberately) বলা হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন,তাহার ভাবান্তর এই, "তাঁহার ধর্ম্ম কি? হিন্দুধর্ম্ম, কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য্য প্রকার হিন্দুধর্ম্ম। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদান্তিকও নহেন। কিন্তু এ সকলই তিনি। তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং বেদান্তমতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি এক জন পৌত্তলিকও বটেন এবং অদ্বিতীয় নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের একান্ত উৎসর্গীকৃত এবং অনুরক্ত ধ্যাতা, যাঁহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার নিকট এই প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সত্তার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ সম্বন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ত্ব। তিনি বলেন যে, এই সকল অবতার, সেই অনন্ত জ্ঞানময় এবং করুণাবিধান অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা এবং শক্তি, যিনি পরিবর্ত্তন এবং নিরাকরণহীন, যিনি অদ্বিতীয়, অসীম এবং অনন্ত, সৎ চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র। তিনি কখন কখন বলেন যে,

রূপাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তাঁহার মাতা বিদ্যাশক্তি কালী দূরে আছেন, কৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে গোপালরূপে, অথবা মধুর ভাবে স্বামী-রূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। নিরাকার ব্রহ্ম সমুদয় গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তিনি নির্ব্বাক আনন্দ এবং ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া যান।

কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার চরণে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা,বৈরাগ্য, চিরবাসনাশূন্য অধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপ-দেশ শিক্ষা করিব।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এবং কথা বাস্তবিক সম্পূর্ণ নূতন। তিনি ব্যক্তি-বিশেষের ধারণানুযায়ী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতেন। তিনি কাহাকে জাতিত্যাগ অথবা ধর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। যাঁহার যে ভাব সেই ভাবের পুষ্টি সাধন করিয়া দিতেন। ভাবের কোন দোষ থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি কখন কোন ধর্ম্মপন্থাকে কাল্পনিক কিম্বা ভ্রমাত্মক বলেন নাই, সুতরাং, সর্ব্বত্রে তাঁহার সমান ভাব ছিল। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া জীবন সার্থক করিতেন, সকল ধর্ম্মের একতা, সকল ধর্ম্মের সমতা তাঁহার নিকটে সম্পন্ন হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল ভাবের উপাসকেরা সেই এক অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণের নিকটে শান্তি লাভ করিতেন। এ পর্য্যন্ত এমন ঘটনা কেহ দেখেন নাই, কেহ শুনেন নাই, কাহারও অদৃষ্টে সংঘটনা হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে সকলে নতশির। মুসলমানধর্ম্মে যাহাদিগকে কাফের বলেন, সেই কাফেরের সহিত একস্থানে উপবেশন, খ্রীষ্টানেরা যাহাদিগকে হিদেন বলেন সেই হিদেনের সহিত এক স্থানে উপবেশন, যে বৈষ্ণব শক্তিউপাসক দেখিলে আন্তরিক দ্বেষভাবে জ্বলিয়া উঠেন সেই বৈষ্ণব এবং শাক্তের এক স্থানে উপবেশন, সন্ন্যাসী গৃহস্থের এক স্থানে উপবেশন সাধু অসাধুর একস্থানে উপবেশন, জ্ঞানী অজ্ঞানীর এক স্থানে উপবেশন, সতী অসতীর একস্থানে উপবেশন, বালকবৃদ্ধের একস্থানে উপ-বেশন, মাতল লম্পট নাস্তিক আস্তিক সকলর একস্থানে উপবেশন, ইহা নিতান্ত অভিনব ঘটনা। এই স্থানেই সকল ধর্ম্মের সমতা দৃষ্ট হয়, এই স্থানেই সকল ধর্ম্ম নিজ নিজ ধর্ম্মের তান উত্থিত করিয়া সমস্বরে বাদিত হইতেছে। যেমন, ঐক্যতান বাদনে বিবিধ প্রকার যন্ত্রের সমস্বর শ্রবণপথে ধ্বনিত হইলে শ্রুতি-মধুর হয়, ধর্ম্মজগতে রামকৃষ্ণদেব অদ্বিতীয় ব্যাণ্ড মাষ্টার এবং তাঁহার নিকটে

সকল ধর্ম্ম-যন্ত্র সমস্বরে বাদিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই বুঝায়। তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অভিনয় অদ্যাপি কোন দেশে কোন কালে করেন নাই। যদ্যপি বিশ্বজনীন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, যদ্যপি বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অভিনয় দেখিতে হয়, তাহা হইলে রামকৃষ্ণদেব ব্যতীত দ্বিতীয় স্থান নাই।

একথা কেহ মনে না করেন যে, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে সমুদয় ধর্ম্মের ভাব একজনকে আয়ত্ব করিতে হইবে, সকল ধর্ম্মের লেজামুড়া বাদ দিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, পাঁচ ফুলের তোড়া হয়, ধর্ম্মজগতে তাহা হয় না। ঈশা, মুষা, নানক, বুদ্ধ, চৈতন্য, নিরাকার সাকার একজাই করাকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভাব বিনিময় করা ধর্ম্মজগতে সম্ভবে না। আমার ধর্ম্ম তুমি লও, তোমার আমি সেই, এরূপ হইতে পারে না। গোলাপফুলের গাছে গোলাপই হয়, তাহাতে জুঁই বেল ফুটে না। জুঁই বেলগাছে গোলাপ জন্মায় না, আঁব গাছে কাঁটাল, কাঁটাল গাছে আঁব ফলে না, যে ফল ফুল যে গাছে ফলে বা ফুটে, সেই গাছ প্রয়োজন। যে যে ধর্ম্মসাধন করিলে যে যে ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সেই সেই ধর্ম্ম ব্যতীত কখন ফুটিতে পারে না। গৌরাঙ্গের প্রেম ভক্তি অতি সুধাময় বটে, কিন্তু তাহা গৌরাঙ্গ-উপাসনা ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। বৃন্দাবনের প্রেমলীলা রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ব্যতীত অন্যত্র লাভ করা যায় না। মাতৃভাবের কার্য্য আদ্যাশক্তি ভগবতী ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্মে তাহা কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিতার ভাব পুত্রে, মাতার ভাব স্ত্রীতে যেমন অসম্ভব, ধর্ম্ম রাজ্যের ভাবও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম অতিশয় প্রশান্ত এবং সর্ব্বজনকল্যাণকর ধর্ম্ম। ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে যে আর কত দিন কাটিয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারেন? আমরা স্বীয় পূর্ব্ব কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপন বুদ্ধি-পরামর্শে আপন ভাবেই আপনাকে পরিচালিত করিতে ভালবাসি, সুতরাং, সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে একটী বিশেষ প্রকার সম্প্রদায় বুঝাইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত আমরা। আমরা নিজ নিজ ভাব চূর্ণ করিয়া একভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছিলাম, যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরা একস্থানে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি করিবার

জন্ম আমরা ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু সেই সময় প্রভু আমাদের মধ্যে এমন একটী পরস্পর অসদ্ভাব জন্মাইয়া দিলেন যে, কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। কাহার ভাব কাহার পক্ষে ভাল লাগে না। পরস্পর স্বাতন্ত্র জন্মিল বটে, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে কেহ ছাড়িতে পারিল না। ক্রমে সময় আসিতেছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি যে, আমরা সকলে এক ভাবে গ্রথিত হইলে রামকৃষ্ণের সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হইবে।

আপনাপন ভাব বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে তবে রামকৃষ্ণের ভাব প্রকাশ পাইবে। রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত ধর্ম্ম সেইজন্ত কেবল আমার তোমার নহে। ইহা আমারও বটে, তোমারও বটে, এবং পৃথিবীর সকলেরই বটে। যিনি যাহা বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, যিনি যাহা ভাবিয়া ঈশ্বরো-পাসনা করিতে চাহেন, তাহাতেই ঈশ্বর লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে! কারণ, রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম বলিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর ভাব সম্বন্ধীয় যে কোন ভাব হউক, তাহার নিন্দা করিবার কাহারও অধিকার নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এই অনুপম ধর্ম্মভাব বাস্তবিক প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হৃদয়ের সামগ্রী। এই ভাবে দ্বেষাদ্বেষী নাই, ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার নাই। প্রভু বলিতেন, যেমন, চাঁদামামা সকলেরই, ভগবানও তেমনি সকলের। ভগবানকে সাধুভাষায় উপাসনা করিলে তিনি শ্রবণ করেন, এমন কোন কথাই নাই। তাঁহার কোন বিশেষ নাম ধরিয়া না ডাকিলে তিনি শুনিতে পান না, এমন কোন কথাই নাই। তাঁহাকে শাস্ত্রবিশেষের মতে উপাসনা না করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না এমন কোন কথাই নাই, যিনি বিধিমতে এবং শাস্ত্রমতে ভগবানকে চাহেন, তিনি সেই রূপেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির সুপন্থা প্রাপ্ত হন। বিধি ব্যাবস্থায় যাঁহার অধিকার নাই, শাস্ত্রাদিতে যাঁহার অধিকার নাই, তাঁহার কি উপায় হয় না? সেই নিরুপায় দিক্‌বিদিক্‌দৃষ্টিশূন্য অনাথের কি অনাথনাথের রাজ্যে সুবিধা হয় না? তাহা হইতে পারে না। প্রভু বলিতেন যে, আমার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। এক ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা, সকলের ভর্ত্তা এবং সকলের পরিত্রাতা। তাঁহাকে ডাক না ডাক, সাধন কর না কর, শাস্ত্র পড় না পড়, সময় হইলে, যেমন তিনিই সকলের আহারের উপায় করেন, তিনি যেমন রোগের ঔষধি দেন, তেমনি তিনি সকলের পরিত্রাণের উপায় করিয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে পাই যে, জলে ডুব দিয়া একমুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করিলে শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, মাতৃগর্ভে জলের ভিতর কিরূপে জীবিত থাকা যায়? আহার না করিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে, কিন্তু মাতৃগর্ভে বিনা ভোজনে কেমন করিয়া একদিন নহে, দুইদিন নহে, সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করা যায়? বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার কারণ দর্শাইবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, তখনও ফুসফুসের কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, সেই জন্য বায়ুর অপ্রয়োজন, সুতরাং বায়ুবিহীন স্থানে তাহার থাকিবার অসুবিধা হয় না। আহারের কার্য্য মাতৃশোণিত দ্বারা সম্পন্ন হয়, সুতরাং, স্থূল ভোজ্য পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এ সুন্দর নিয়ম কাহার? এ সুন্দর ব্যবস্থা কাহার? সেই বিশ্ববিধাতার কি এ সকল কার্য্য নহে? যুগে যুগে কত জগাই মাধাই তরিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা শুনিতে পাই। কে তাঁহাদের পরিত্রাণ করেন? সাধুরা? কখন না। পণ্ডিতেরা? কখন না। কোন বিশেষ দেবদেবী? কখন না। তবে কে পথভ্রান্ত আত্মভ্রান্ত নরনারীর কল্যাণ সাধন করেন? তাঁহাদের কল্যান সাধন হয় ইহা সত্য ঘটনা। যেমন, যোগীর পরিত্রাণ হয়, যেমন জ্ঞানীর পরিত্রাণ হয়, যেমন সাধকের পরিত্রাণ হয়, যেমন ভক্তের পরিত্রাণ হয়, তেমনি পাষণ্ড, বর্ব্বর, মূর্খ, অজ্ঞানী, অভক্ত, মাতাল, লম্পট, বারাঙ্গনারও কিনারা হয়। তাহারা কুল পায়, সশরীরে দেবতা বাঞ্ছিত পরম পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। আমরা একথা শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। সশরীরে আমরা সম্ভোগ করিয়াছি, গঙ্গাজল, তামাতুলসি স্পর্শ করিয়া একথার সাক্ষ্য দিতে পারি। মহাশয়! ভগবান যগুপি জ্ঞানীর একচেটে হইতেন, ভগবান যগুপি পরিমার্জ্জিত ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিতের একচেটে হইতেন, যগুপি নীতিজ্ঞ ভদ্রলোকের হইতেন, তাহা হইলে আমাদের কস্মিনকালে উপায় হইত না। আমরা যে পাষণ্ড নরাধম ছিলাম, তাহাই থাকিতাম। আমরা ভগবান দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার প্রসাদ খাইয়াছি, আমরা তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া পরিণত হইয়াছি। এ সৌভাগ্য পণ্ডিতের হয় না, এ সৌভাগ্য জ্ঞানীর হয় না, এ সৌভাগ্য কর্ম্মীর হয় না, এ সৌভাগ্য ধনীর হয় না; এ সৌভাগ্য মানীর হয় না, যাহাদের কেহ নাই অনাথনাথ তাহাদের। পতিত বলিয়া সমাজ যাহাদের অবজ্ঞা করে, সেই পতিতদিগের জন্য পতিতপাবন। যাহারা নির্ধনী, পথের কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী, তাহাদের জন্য কাঙ্গালের ঠাকুর। এ কথা কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী ব্যতীত অন্যের বুঝিবার অধিকার নাই।

ধনের গর্ব্বে ধনী গর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে পণ্ডিত গর্ব্বিত, সাধনাগর্ব্বে সাধক গর্ব্বিত, ভগবানের সম্বন্ধ সেথায় স্থাপিত হইবে কিরূপে? এই নিমিত্ত কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীরাই যুগে যুগে অগ্রে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

সমাজবিতাড়িত সাধারণের ঘৃণিত পাষণ্ডপুঞ্জের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের এত মাথা ব্যথা কেন? সামঞ্জস্যস্থাপন করা তাঁহার কার্য্য। যখন পাষণ্ডেরা বলবান হয়, তখনই তাহাদের দলন না করিলে সাধারণ সমতা রক্ষা হয় না। অত্যাচারী রাবণের দ্বারা স্বর্গমর্ত্তপাতালের সমতাভঙ্গ হইয়াছিল, তাই ধনুধারী রামচন্দ্রের অবতরণ। কংশের অত্যাচারে যখন সকলের শান্তিভঙ্গ জনিত মনের সমতা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হিংসাবৃত্তির উত্তেজনায় যখন সর্ব্বসাধারণের মানসিক অসমতা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দুর্ব্বল কলির জীবের সাংসারিক আসক্তির প্রাবল্যজনিত স্বার্থপরতা বৃদ্ধি, জ্ঞানবিলুপ্ত এবং পশুবৎ আকারে পরিণত হওয়ায় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবনীমাঝারে প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া আপামরকে প্রেমিক করিয়া সমতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে জগাই মাধাইকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপা না করিলে তাহাদের কি কখন অন্য উপায় হইত? বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্রে সকলের মনে সমতাভঙ্গের বিলক্ষণ লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। চারিদিকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। যাহাতে একভাবে এক স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নরনারী উপবেশন করিতে পারেন, যাহাতে সকল ধর্ম্মের সারভাগ মন্থনপূর্ব্বক একস্থানে সংস্থাপিত করিতে পারেন, পরস্পর সৌভ্রাত্রসূত্রে গ্রথিত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছাদি সমুদয় মনুষ্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, এমন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হওয়া উচিত। কেশববাবু এইরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন, চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মমণ্ডলীতেও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের অভিনয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এ প্রদেশেও স্থানে স্থানে ঐরূপ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে। লোকের এইরূপ অবস্থা হইবে জানিয়া ভগবান তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে রামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মজগতের আভ্যন্তরিক কার্য্য, যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যদ্যপি বিশ্বজনীন ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরা একবার মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করেন—শিক্ষা নহে কার্য্যে করিয়া দেখেন—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বা বিশ্বজনীনরূপে পরিণত করা যায় না। সাধনা অদ্ভুত সামগ্রী। আমরা

সামান্ত অর্থকরী বিদ্যার সাধনায় যেরূপ ফল ফলিতে দেখিতে পাই, তাহা বিচার করিয়া বুঝিলে বলিতে হয় যে, শিক্ষা না করিলেও হয় না এবং শিক্ষা করিলেও হয় না। সাধনাপথে বিঘ্ন অসীম। গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে এবং কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করা যায় না, তাহার হেতু এই যে, ধর্ম্ম সাধনলব্ধ বস্তু। সাধনায় অধিকার কাহার আছে? যদিও থাকে তাহা কয় জনের সম্ভবে? যদ্যপি তাহার সম্ভাবনাই হয়, তাহা হইলে স্থূলজগতের ক্ষুদ্রতম মনুষ্যের কি কখনও সমুদয় ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিবার সাধ্য হইতে পারে? সারাংশ লইতে হইলে তাহার সাধনা চাই। সাধনা করিলে সময়ে তাহার সারাংশ লাভ হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি কাহাকে সমুদয় ধর্ম্মের সারাংশ বাহির করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় সাধক হইতে হইবে। সাধক হইলে সাধনা করায় কে? রামকৃষ্ণদেবের নিকটে সিদ্ধপুরুষদিগের যে প্রকার সমাবেশ হইয়াছিল, এ প্রকার ঘটনা কি অদ্যাবধি কোন স্থানে হইয়াছে? সেই অদ্ভুত ব্রাহ্মণীর ন্যায় দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের ইতিবৃত্ত কি কেহ কখন পাঠ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণী হিন্দুকুলোদ্ভবা বলিয়া পরিচিত, বয়সে নবীনা, হিন্দুর সমুদায় শাস্ত্রে অধিকার ছিল। বেদ জানিতেন, পুরাণ জানিতেন, তন্ত্র, একখানা নহে, পঞ্চতন্ত্রের সমুদয় জ্ঞান ছিল, কেবল তাহা নহে, এই সকল শাস্ত্রের সাধনাপ্রণালী তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উর্দ্ধমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ সাধনাদিতে সেই ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবকে আপনি সমুদয় সহায়তা করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা উপন্যাসের চরিত্র রচনা নহে; কখন কি জীবের ভাগ্যে সংঘটিত হয়? তাই বলিতেছি যে, ইহা ভগবানের লীলা ব্যতীত কিছুই নহে। বর্ত্তমান কালের যেমন প্রয়োজন হইবে, তাহা জানিয়া রামকৃষ্ণরূপে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ভাসিত হইয়া পরম পবিত্র গীতায় লিপিবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কার্য্যের দ্বারা সেই ভাবের অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। আমি পুনরায় বলি যে, ভাব লইয়া সকলেই স্বতন্ত্র। ভাবের মিশামিশি হইতে পারে না, ভাব বিনিময় হইতে পারে না। এক ব্যক্তি যেমন, আর এক ব্যক্তি তেমন হইতে পারে না, তেমনি তাহার যে ভাব তাহা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সময়ে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যেমন, শরীর বিকৃত হইলে জল জলে যায়, মাটি মাটিতে যায়, জল মাটি কাহারও স্বতন্ত্র

নহে, সেইরূপ ধর্ম্মভাব পরিশেষে এক অদ্বিতীয় ভগবানেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথাটি বুঝিবামাত্র অমনি আপনার ভিতরে সমতা স্থাপন হইবে। আপনি স্নিগ্ধ হইলে জগৎও স্নিগ্ধ হইয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বজনীন ধর্ম্ম যে প্রকারে উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার কার্য্যে প্রদর্শন করিয়াছেন, সে প্রকার ধর্ম্ম কখন কোন ব্যক্তির সাধনের ধর্ম্ম হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, কিছু শিক্ষা এবং কিছু সাধন করিতে হয়। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্বৈতজ্ঞান শিক্ষা করিয়া যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ যাহার যাহা ধারণা, যাহা যাহার আনন্দকর, যাহা যাহার রুচিজনক, তাহাই তাহার করিবার বিষয়।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বিশ্বজনীন ধর্ম্মের যে সাইক্লোন উঠিবার বিভীষিকা আশঙ্কা হইতেছিল, তাহা নিবারণের সুন্দর উপায় প্রাপ্ত হওয়া গেল। রামকৃষ্ণের উপদেশরূপ কীলক ধারণ করিয়া থাকিলে কখন কোন বিপদ সংঘটনা হইবে না।

এইজন্য বলি যে, রামকৃষ্ণদেব সকলের এবং সকলেই রামকৃষ্ণদেবের। রামকৃষ্ণদেব যেমন হিন্দুর, রামকৃষ্ণদেব যেমন মুসলমানের, রামকৃষ্ণদেব যেমন বৌদ্ধের, রামকৃষ্ণদেব তেমনি সকলের। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বত্রে এক অদ্বিতীয়, কিন্তু সকলে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান ম্লেচ্ছাদি স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র থাকাই রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম্মের অভিপ্রায়।

এতক্ষণে, বোধ হয়, বুঝিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব চিরপ্রচলিত ধর্ম্মলোপ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, তিনি ধর্ম্মভাবের বিপর্য্যয় করিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, তিনি জাতিকুল বিনষ্ট করিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, যথেচ্ছাচারীতার প্রশ্রয় দিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই, জাতি, কুল, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত কলেবর ধারণ করিয়া দেশ, কাল এবং পাত্র বিচারপূর্ব্বক তৎ-সমুদয় অভিনয় করিতেছিলেন। সেই অভিনয়—সেই অপূর্ব্ব অভিনয়—কেহ দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই, কেহ শুনিয়াছিলেন এবং কেহ শুনেনও নাই, সহসা স্থগিত হইয়া গেল। আজ নবম বৎসর পূর্ণ হইয়া দশম বৎসর হইল, সেই রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিপতিত হইয়া গিয়াছে। একবার মনে হয় যে, কলির জীবের সৌভাগ্য অসীম, যেহেতু, লীলাময়ের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়াছে। আবার মনে হয় যে, কলির জীবের ন্যায় এমন হতভাগ্য আর কোনকালে জন্মায় নাই। হতভাগ্য বলিবার হেতু এই

যে, এমন অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতে পারিল না। সংসারক্ষেত্রে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে আসে যায়। দুঃখ আসিলে সুখের প্রত্যাগমন আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রভু সম্বন্ধে সে আশা আর নাই। তিনি দ্বারে দ্বারে গৃহে গৃহে আপনি স্বইচ্ছায় গৃহস্থের অনভিপ্রায়ে, মনতুষ্টি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার সামগ্রী দিয়া কেঁদে কেঁদে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। ধনীরা ধনের গর্ব্বে অন্ধ। তাহা চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে কাঙ্গাল ঠাকুর প্রেমিক কাঙ্গালের বেশে তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। একদা কোন ক্রোরপতির বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হন। সেই বাটীর কর্ত্তৃঠাকুরাণী প্রভুকে পূর্ব্বে চিনিতেন। ঠাকুরকে দেখিয়া কর্ত্তৃঠাকুরাণী বিশেষ আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিলেন। সায়ংকাল সমাগত দেখিয়া প্রভু বিদায় চাহিলেন। কর্ত্তৃঠাকুরাণী পরমানন্দে কহিলেন, "বাবা! আহা! তোমার কি মিষ্ট কথা? কথা শুনিতে শুনেতে সব ভুলিয়া যাই। মাঝে মাঝে এস।" ঠাকুর বাহিরে আসিয়া পুনঃরায় অতিব্যস্তে অন্তপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ওগো! তোমরা আমায় কিছু খেতে দিলে না।" গিন্নি অপ্রতিভ হইয়া একটী সন্দেশ আনিয়া দিলেন। ঠাকুর তাহার কণিকা মাত্র স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরের এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে লোভী বলিতে পারেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা বলা যায় না। লোভী একটি সন্দেশ পাইয়া তাহার কণিকা গ্রহণ করিলেন কেন? একদিন একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে, আমি কি বিপদেই পড়িয়াছি,তাহা আমিই জানি। আমার বিপদ অপরে কিরূপে বুঝিবে? যাহার যন্ত্রণা হয় সে আপনিই বুঝিতে পারে, অপরকে বুঝান যায় না। আমায় কেহ ডাকিতে চাহে না, বাটীতে লইয়া যাইতে চাহে না, কি করি আমার নিজের প্রয়োজন, সুতরাং, আপনিই একটা হেতু করিয়া যাই, পরিচয়ও দিই, বুঝিয়াও বুঝে না, দেখিয়াও দেখে না, অমনি বিদায় করিয়া দেয়। যদ্যপি কিছু চাহিয়া না ভক্ষণ করি, তাহা হইলে গৃহস্থের অকল্যাণের আর সীমা থাকিবে না। শাস্ত্রের বিধি আমি কিরূপে অমান্য করিব। তাই কিছু চাহিয়া মুখে দিয়া আসি। তাঁহার কাঙ্গালবেশ, কাঙ্গালভাব দেখিয়া কেহ প্রহার করিতে আসিত, কেহ গালাগালি দিত, কেহ বিক্রপ করিত, তিনি অঞ্জলী পাতিয়া সমুদয় গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। প্রেমের পাগল, প্রেমচূড়ামণি, প্রেম দিতে হয়, তাহাই সাধ্যমত ঢালিয়া দিয়াছেন। আমরা কলির জীব

অপ্রেমিক, আমাদের সছিদ্র হৃদয়-কুম্ভ, কাম ক্রোধাদি নানাবিধ ছিদ্র দিয়া প্রেমবারি বাহির হইয়া গেল। প্রেমের ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম না। ঠাকুর কেঁদে কেঁদে গিয়াছেন, এখন আমাদের কাঁদিবার দিন পড়িয়াছে, এখন আমরা কাঁদি। কাঁদিতে পারি কৈ? এখন মনে হয় যে, প্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লই, কিন্তু কাঁদিতে পারি না। নয়নের জল নয়নেই শুষ্ক হইয়া যায়। বিরহাদির উত্তাপে বাষ্প হইয়া যায়, কাঁদিব কিরূপে? প্রভু! কৃপা করুন, যেন নয়ননীরে আমাদের হৃদয়ের অপ্রেমিকতাবৃত্তিগুলি বিধৌত করিয়া, রামকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতে পারি।

গীত।

কুল্ল প্রাণে, মধুর তানে, গায় বিহগ গহনে।
গায় যশরাশি, রবি তারা শশী, গ্রহগণে গগণে॥
অনিল ধায় ফুল দোলায়, কহে ধীরে তায় স্বজন যায়,
অলি গুণগুণে, ঊষা সমীরণে, মহিমা তাঁর বাখানে॥
অধীরা ধরণি নিরত ধায়, সে জানে সে চলে কার কথায়,
নগ নতশিরে, দামিনী শিহরে ব্যাকুল জলধি চুমিতে চরণে॥
দীন হীন জনে, আকুলিত প্রাণে, নিরুপায় যবে চায় মুখপানে,
কৃপাময় কৃপাবারি বরিষণে, জুড়াও তাপিত জীবনে॥

রসনায় নাম পরশে তরে যায়।
মনে বা শ্রবণে, শয়নে স্বপনে, ধ্যানে কিবা ধারণায়॥
সেই গুণধাম, সম সব নাম, যে ভাবে যে চায়, সে ভাবে সে পায়,
নাম তায় নিশ্চিত উপায়॥
সাধন ভজন, চাহে কোন জন, করে কেহ সাধে নাম আলাপন,
কি নাম না জানে, দৈবে উচ্চারণে, লভে চির করুণায়;—
সরল প্রাণে আপনি সে বলায়॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কিবা কায়মনে, ভ্রমবশে রসনায়,
পরিহাস ছলে, নাম তার নিলে, অবহেলে পায় চরণকৃপায়;—
যদি রসনা চুরি ভাবের ঘরে তায়॥

যা বল সে একই সকল।
যদি ভাবের ঘরে না রয় গোল॥
গুরুদত্ত আপন জনে, ডাক্‌লে পরে শোনেই শোনে,
সরল প্রাণে হয় না বিফল;
প্রাণ যদি ধায় ক্ষণের তরে, দয়াল ঠাকুর রইতে নারে,
আদর করে কাতরে দেয় কোল;
(আজি) শরণ নিয়ে চরণতলে কররে জনম সকল॥

ডাকরে ডাকরে মন দিন যে ফুরায়ে যায়।
যে নামে যে ভাবে ডাক, সেত তাতেই শুন্‌তে পায়॥
না বাধে তার নামভেদে, ঈশা মুষা মহম্মদে,
কালী তারা হরিপদে, সম সে উপায়॥
যতই ধরম ভবে, নহে কেহ একভাবে,
মতভেদে একেরই পূজায়;—
নানা ফুলে গাঁথা মালা একটী সুত'র বাঁধন তায়॥

এ ধরা তোমার, এস বারে বার,
দেহ ধরি হরি হরিতে ভার।
বেদের উদ্ধার, অবনী আধার, দানব দুর্ব্বার, করিতে সংহার,
বলি ছলি কর পাতালে বিহার, দয়াময় তব মায়া বুঝা ভার॥
তুমি ভৃগুপতি ক্ষত্রিয় নিধনে, তুমিরঘুপতি সত্যের পালনে,
তুমি যদুপতি হেরি বৃন্দাবনে, প্রাণ হরি গোপিকার॥
বুদ্ধরূপে জীবে অপার করুণা, অহিংসা ধরম পরম ঘোষণা,
নদীয়ায় গোরা, প্রেমে মাতুয়ারা, বিলাইলে প্রেম ফিরি দ্বারে দ্বার॥
আগমন ভবে যবে প্রয়োজন, দুষ্কৃতি দমন, ধর্ম্মের স্থাপন,
সাধন ভজন, বঞ্চিত যে জন, রামকৃষ্ণপদ সার॥

একি স্বপন, কোথায় রতন, হৃদয়-আসন শূন্য ক'রে।
যে ফুলহারে, সাজায়ে তোমারে, হেরিতাম মনসাধে নয়ন ভরে;—
আজি সে কুসুমহার পরাণ বিদরে॥
আর কে আমায় আমার ব'লে, আদর করে কোলে তুলে,
মুছায়ে সকল মলা জুড়াবে জীবনে;—
ছিলেনা ত নিদয় এত, কোথায় লুকালে নাথ,
এস নাথ এস ফিরে ক্ষণেক তরে;—
ধোয়াব চরণদুটি আজি আঁখিনীরে॥

আপনি পাগল পাগল করে সবারে।
এমন প্রেমের পাগল হয়নি রে আর, প্রেম বিলায় যারে তারে ॥
কি ভাবে সে বিভোর কে জানে, ধারা বহে নয়নে,
দীনের ব্যথা সয় প্রাণে প্রাণে ;—
বলে না হয় যদি সাধন ভজন, ভার দিবি আয় আমারে ॥
দীনের দুঃখ আর ত রবে না, অভয় চরণ কারো নয় মানা,
কাতর প্রাণে ডাক্‌রে রসনা ;—
সুধামাখা মধুর নাম বলরে বদনভরে ॥
বল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে বদন ভরে ॥

নমো

লিপিঃ লম্বোদরায়।

ভূমিকা

শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, ইত্যাদি বিদ্যা সমূহের মধ্যে সংগীত বিদ্যা বিশেষ আদরণীয়া মন্য মানা হইতে পারে, তদ্ধেতু এই বিদ্যালোচনার দ্বারা যেমন তদ্বিদ্বৎ ব্যক্তির চিত্তোল্লাস হয় তেমনি শ্রোতা যে অন্য জন সে জনের মনেরো মহোল্লাস জন্মে, স্বপক্ষ ও পর পক্ষ উভয় পক্ষে মঙ্গল সূচনা করিতে অন্য বিদ্যার প্রায় ঈদৃশী শক্তি বিরহ, বিশেষতঃ সংগীতের এই একখানি আশ্চর্য্য মাধুর্য্য যে নিজের আমোদ ও পরের বিনোদ ছলে জগদম্বার গুণানুবাদন, ও হরিনাম সংকীর্ত্তন, যে মহাপুণ্য তাহা অনায়াশে লাভ হয়, এই পরম পদার্থের কিয়দংশে অংশী হওনাভিলাসে বিবিধ বিদ্যা বিশারদ শ্রীমদ্রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে অনুমতি দিয়া নিবেদন করিলাম যে জগদীশ্বরের ও জগদীশ্বরীর গুণানুকথন স্বরূপ গীত চয় প্রস্তুত করেন, যে তদাবলী কুমুদিনী হৃৎ সরসীতে উৎফুল্লা হওত দিগ্‌দেশ আমোদিনী, বিশেষ সুমকরন্দপানে পরমার্থ বুবুক্ষু মানস ভৃঙ্গের হৃষ্ট বৰ্দ্ধিনী হইতে পারে, পশ্চাৎ সেই পুস্তকী শরচ্চন্দ্রিকা সমাজান্তরীক্ষে উদিতা করাইয়া লিপ্সু

মানস চকোরানন্দ সানন্দ করাইব, তদনুক্রমে শ্রীযুক্ত ভট্টা চার্য্য মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর গীত কবিতা রচিতা ও প্রক টিতা করণেতে সেই শর্ম্ম সম্বন্ধিনী গানরূপিনী কাদম্বিনী দৃষ্টে হৃষ্টে চিত্ত শিখী সুখী হইয়া নিত্য নৃত্য করিতে থাকিল।

কবিতা রসমাধুর্য্য কবির্বেত্তিনতৎকবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটি ভঙ্গি ভবোবেত্তিন সাপূনঃ ॥

পরে বাদ্য ও রসনা যন্ত্রে যন্ত্রিত করণক রাগ রাগিনী তাল মান সহোযোগে মিলন ও ঐক্য করিলাম, এক্ষণে প্রয়াশ ও প্রত্যাশ এই যে ঐ সকল গীত দেশীয় সমাজে ব্যবহার্য্য রূপে গ্রাহ্য হয় এই ভরসায় "সংগীতানন্দ লহরী" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক মুদ্রা যন্ত্রালয়ে প্রেষণ করণে সহসা সাহসী হইলাম। প্রবর গুণি গণৈকান্তভাজন শান্ত দান্ত বিচক্ষণ মহাজন গণের অনুরাগ জীবন দ্বারা হীন সংস্কার রূপ জীবন বিহীন মীন জীবন প্রাপ্তে মানস সরোবরের শোভাকর হওনের প্রতীক্ষা। যতঃ

স্বর্ণবৎ দোষ মুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তত্তয়ূর্যথা।

কিম্পুনর্ভদ্রতমোষিতি ১২৫৪ বঙ্গাব্দীয় মৃগেন্দ্রস্যৈক বিংশতি দিনজেয়ং লিবিঃ।

শ্রীমাধবচন্দ্র চৌধূরী।
আন্দুল ধাম।

মোং নওয়াবগঞ্জ।
জিলা রাজশাহী।

শ্রীশ্রীগুরুঃ ॥

র্ব্বিজয়তাং ॥

সংগীতামৃত লহরী।

প্রথমখণ্ডং মুদ্র্যতে ॥

শ্রীভবানী বিষয়ক গীতাবলী ঃ

রাম কিরী বা রামকেলী রাগিণ্যাং ॥ খয়রাতালেন গীয়তে ॥

দ্বাদশ দল কমল কোরে, নাথ মেরি বিরাজে ॥ ধ্রুং ॥ দশ শত দল, কমল বিমল, শ্বেতচ্ছত্র রাজে ॥ ॥ অকথমে ত্রিকোণ ভবন, আরে শোভে হ লক্ষ বরণ, হংস পীঠে বীজ বয়ঠে, চরণে অরুণ লাজে ॥ ১ ॥ শ্রীমুখ সুখস্মের হসন, করুণা নয়ন অবলোকন, বরাভয় কর শ্বেত বরণ, শ্বেতাভরণ সাজে ॥ ২ ॥ যোগাসনে বামে ললনা, চিন্তামণি বরণ লগনা, মগনা শ্যাম বসমে আপ্, কোটি মদন গাজে ॥ ৩ ॥ জ্ঞান ভান ভয়ে প্রকাশ, মায়া রজনী গেয়ী বিনাশ, ভোর হিঁ শ্রীরামচন্দ্রে, চরণ স্মরণ দিজে ॥ ৪ ॥

শ্রীনাথ চরণ, নিত্যসদন, চিন্ত্য ব্রহ্ম কালে ॥ ধ্রুং ॥ অরুণ চরণ, শ্বেত বরণ, শোভিত শশী ভালে ॥ ❋ ॥ অপরূপ রূপ বামে শোভিত, ভাবয়ে সাধক জন অদ্ভুত, উভয়ের চিত সাম রসিত, দশ শত দল কমলে ॥ ১ ॥ যে জনে চিন্তে সতত মননে, নাস্তি উপমা তার ত্রিভুবনে, রামচন্দ্র বলে সেই সে সফলে, নাহি শিব মনু বিফলে ॥ ২ ॥

কালী কালী বল, বৃথা দিন গেল, মানব দেহ হবেনা আর ॥ ধ্রুং ॥ জনন মরণ, দেহ ধারণ, অশীতি লক্ষ অনিবার ॥ ❋ ॥ কয়ে গেছেন্ এবার কর্ণধার, কাল সে সকলি সকলে সার, বিশেষত কলি শূন্য সকলি, কালীনাম সব তত্ত্বসার ॥ ১ ॥ সার্থক দেহ মানিরে তার, যে জন কালী২ নাম জানে সার, সেই সে ধন্য ভুবনে মান্য, কালী কুলান তার ভবেরি ভার ॥ ২ ॥ সাধন স্মরণ, ভজন হীন, রামচন্দ্র দীন দীনের প্রবীণ, হতো সত সঙ্গ কালীর প্রসঙ্গ, অবশেষে গতি হবে কি তার ॥ ৩ ॥

আজু শুভ দিন, হইবেরে মনো, কালী কালী কর স্মরণ ॥ ধ্রুং॥ সুপ্রভাতা যদি হইলো রজনী, সফল করোরে জীবন ॥ ❋ ॥ কালীতে অভিন্ন-কালীর নাম, নিতান্ত পাইবে মোক্ষধাম, পূরিবে সকলি মনেরি কাম, ত্রিতাপ হইবে

মোচন ॥ ১ ॥ গঙ্গা গোদাবরী, যমুনা কাবেরী, সরস্বতী আদি যত তীর্থ বারি, স্নানদান পান করে যদি ভূরি, নহে কালী নামে তুলন ॥ ২ ॥ অযোধ্যা মথুরা কাশীআদি ধাম, না মরিলে ইথে না পূরায় কাম, অবিরত নয় যে জনা নাম, সমান জীবন মরণ ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র কালী দাসের দাস, মুক্ত হবে তবে মায়ারি পাশ, যদি ভ্রমে কয় কভু নামা ভাস, আসিতে না হবে কখন ॥ ৪ ॥

প্রসন্না ভব ভবে, মরি দীনে গঙ্গে, ত্রিপথ গামিনী। ধ্রুং ॥ সুখদা মোক্ষদা, বিশেষ ফলদা, অশেষ অশুভ নাশিনী ॥*। শ্বেত বরণী পঙ্কজ ধারিণী, কমলাসনী মকর বাহিনী, দ্বিভুজা ত্রিনেত্রা বিচিত্র বরদা, সরিদা ব্রহ্ম রূপিণী ॥ ১ ॥ মদনান্তক মৌলি রঙ্গিণী, মেরু মন্দরে মন্দাকিনী, প্রজাপতি কর কমণ্ডলু গতা, ব্রহ্মানন্দ দায়িনী। ২ ॥ গিরীন্দ্র তনয়া সপত্নী সুভগা, সুর তরঙ্গিণী সুর নিম্নগা, সুরধুনী স্মরহর বিলাসিনী, অপগা বিশ্বপাবিনী ॥ ৩ ॥ জহ্নু তনয়া ভীষ্ম জননী, যমুনা বানী সহ গামিনী, সাগর সঙ্গিনী সগর বংশে, ব্রহ্মশাপ মোচনী ॥ ৪ ॥ ত্রিতাপ মোচনী ভক্তি দায়িনী গতি হীন জনে গতি কারিণী, শরণাগত রামচন্দ্র, জনম মরণ বারিণী ॥ ৫ ॥

ভৈরব রাগেণ ॥ একতালা তালেন গীয়তে ॥

মন কেন করিলি এমন, বিষম নেঙ্‌টা মেয়ের আশা ॥ ধ্রুঃ ॥ কুলে দেয় কালী, তার নাম কালী, ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম নাশা ॥ * ॥ নাশে সুখ মোক্ষ, সপক্ষ বিপক্ষ, করায় শ্মশান বাসা ; করে বর্ণান্তর, ঘুচায় সব ডর, ঘর বাহির ফরসা ॥ ১ ॥ পরায় কৌপীন, করে দীন হীন, মাথা মুড়া জটা বল্কলবাসা ; ছাই মাথা গায়, ইচ্ছা যা তা খায়, নাচে গায়, শেষে কান্দা হাসা ॥ ২ ॥ নাহি আপন পর, করে সকল ঘর, শুনে লাগে ডর, কিহবে দশা ; ভক্তিভাবহরা, কেবল প্রেম করা, বিঘ্ন করে না দেয় হৈতে দাসা ॥ ৩ ॥ কালীগঞ্জে বাস, রামচন্দ্রের আশ, শ্যামা পদাশ্রয় দূর লালসা ; করি মেয়ের আশ, গেল সর্ব্বনাশ, শ্মশান বাসী হৈল কীর্ত্তিবাসা ॥ ৪ ॥

মন জাননা তারে, কালী কেমন মেয়ের মেয়ে সেটী ॥ ধ্রুঃ॥ পুরুষ প্রকৃতি, অবিশেষ মূরতি, কেউ নারে তারে করিতে খাটী ॥ * ॥ করি তন্ন২, ষড় দরশন, ভেবা ঘরে গেল খেয়েমাটী ॥ * । দ্বৈতা দ্বৈত বলে, শ্রুতি ক্ষান্ত ফলে, কি তার অন্যে জানে পরিপাটী ॥ ১ ॥ মাথায় খাটের খুরা, করে তিন বুড়া, শুয়ে আদি বুড়া করে ভ্রূকুটী ॥ * ॥ নাভি মূলে বসি, হয়ে মুক্ত কেশী, হৃদে দোলায় রাঙ্গা চরণ ছুটী ॥ ২ ॥

কার সাধ্য বটে, দক্ষিণার নাটে, ভার লয়ে করে আটাঁ আঁটি ॥ * ॥ দিব্য বীরাচার, বেড়ায় দ্বারে দ্বার, পশু মৈল কত দাঁত কপাটী ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র কয়, নাহি কিছু ভয়, মনের কদাশয়, গিয়াছে ছুটি ॥ * ॥ বেচি আপন কায়, শ্রীনাথের পায়, গেছে তার ভব বন্ধন কাটী ॥ ৪ ॥

আলাহাইয়া বেলাওল ॥ তাল আড়া ॥

কেরে ঘন নীল নীরজ, মদ গঞ্জিত, স্থকিত চপলা মালা, বালা নব রঙ্গিণী ॥ ধ্রুং ॥ রজত শিখরো, সবাকারো, রূপ দিগম্বরো, পুরুষ সুন্দর সহ, রতি পতি বিড়ম্বিনী ॥ * ॥ উদিত হৃদয়াকাশে, জ্ঞান নেত্রে সুপ্রকাশে, অন্য থাকি সে বিকাশে, সম্ভব না হয় ॥ * ॥ যে রূপে যে চিন্তাকরে, সই রূপ দেখে তারে, ঘটেং সেই বটে, ভক্ত মনো রঞ্জিনী ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, ভাবি রূপ নিরন্তরে, চিদানন্দ ময় ॥ * ॥ যে জন এইরূপ ভাবে, ভাবে সঙ্গ নাহি পাবে, রামচন্দ্র পশুভাবে, মূঢ় অজ্ঞানী ॥ ২ ॥

মাগো কত দিনে নিস্তার হবে, বক্রী কি আছে গো দুঃখ না জানি শিবে ॥ ধ্রুং ॥ বহুকর্ম্ম সূত্র দ্বারে, বদ্ধ মায়া কারাগারে, অনন্ত কামনা বেড়ি, কিসে কাটিবে ॥ * ॥

মনো রাজা অবিচারে, দেহ দণ্ড সদাকরে, দ্বার রক্ষা করে রিপুগণ প্রতি দ্বারে ॥ *॥ দোহাই দিতে গো চাই, স্বাবকাশ নাহিপাই, রসনা ঘোষণা ভয়ে, কুণ্ঠিত ভাবে ॥ ১ ॥ ত্রিতাপে সদা তাপিত, যন্ত্রণায় জনম গত, হয়েছি জীবন মৃত, পাপের আধার ॥ * ॥ কেহ না সম্ভাষে দাসে, অকৃতি বলিয়া হাসে, রামচন্দ্র এই ভাষে, গতি নাই ভবে ॥ ২ ॥

অরে মন ধিক তোমারে মজাইলা, সফল মানব দেহ বিফল করিলা ॥ ধ্রুং ॥ মরিতে না হবে যেন, নিতান্ত ভেবেছ মন, বিষম কালের ভয়, কিসে এড়াইলা ॥ * ॥ হইয়া কুসঙ্গি সঙ্গ, পরমার্থ দিয়া ভঙ্গ, দেখিয়া বিষয় রঙ্গ, রঙ্গী হইলা ॥ ১ ॥ তুমিতো সকলি জান, অনর্থে সার্থতা মান, এইতো আশ্চর্য্য জ্ঞান, ভুলিলা ভুলাইলা ॥ ২ ॥ অবিশ্রান্ত বহ ভার, শ্রান্তি দূর নাহি কর, একি ভ্রান্তি দেখিতোর, গর্দ্দভের প্রায় ॥ ৩ ॥ বিষয়ে মার্জ্জারশ্রম, ত্যজি যাহ লজ্জাক্রম, রামচন্দ্রে হেন ভ্রম, তুমি ঘটাইলা ॥ ৪ ॥

রাগিণী বেলাওল ॥ তাল আড়া ॥

মাই তেরি নীর, নির্ম্মল দরশন মে, হরত জনম২ কেরি পাপ ॥ধ্রুং ॥ কীট পতঙ্গ অধম, নর খর পশু পরশ মে

তাকো, তরসে ত্রিতাপ ॥ ❋ ॥ নিরঞ্জন নিরাকার, পরং ব্রহ্ম ময় বার, আগম নিগম সার, মহিমা ভূরি ॥ ❋ ॥ শিরেধরে ত্রিপুরারি, কো জানে ক্যা গুণ তেরি, মিলে চতুর বরগ, যো করে আলাপ ॥ ১ ॥ তাবতহি গতাগত, করতহি অবিরত, নাহি মরে যাবত, গাঙ্গনীরে ॥ ❋ ॥ কহত শ্রীকবি রাম, জগত অধমাধম, মিলত পরম পদ, সব শৌচ মাপ ॥ ২ ॥

রাগিণী বেলাওল আলাহাইয়া ॥ হরি তাল ॥

অরে মন, নীল বরণী চরণ, কেন ভাবনা ॥ ধ্রুং ॥ ক্ষিতি অপতেজ মরুত ব্যোমেতে ধারণা, মিছা জন্য দেহ ভেবে দেখ না ॥ ❋ ॥ মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপূরে সাধ ধ্যানে, অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন ॥ ❋ ॥ আজ্ঞা চক্র করি ভেদ দেখ না, কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না ॥ ১ ॥ ঈড়া সুসুম্না পিঙ্গলা, যোগ পথ করি আলা, আছে মন আমারো কেন পাইতেছো জ্বালা ॥ ❋ ॥ নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়া থাকেনা, কালে কোন কালে খুঁজে পাবে না ॥ ২ ॥ ইহাবহি আরো নাহি, যোগ পথের উপায় এহি, ভাব পরাৎপরা সেহি কালী ব্রহ্মময়ী ॥ ❋ । থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবেনা, রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবেনা ॥ ৩ ॥

রাগিণী ঝিঝিট ললীত॥ তাল ধিমাতেতালা॥

জাগোনা কুণ্ডলিনী কালী, অলসে ঘুমাইয়া রহিলি গো॥ ধ্রুং॥ স্বয়ম্ভূ মদনাগারে, বিষ তন্তু সহোদরে, বিচিত্রা ভুজঙ্গী হয়ে, ত্রিগুণে বান্ধিয়া থুলিগো ॥ ১॥ অজপায় দেহ ধারণ, করি জীব অচেতন, বহির্মুখ করি তারে, কুহকে ভুলাইয়া দিলি গো ।। ২॥ রামচন্দ্রে করিদয়া, ঘুচাও গো অনাদি মায়া, আশা বাসা ভাঙ্গি তবে, কালে কালী দিয়া চলি॥ ৩॥

যেমন জননী তুমি, জানাইলা জানিলাম আমি গো ॥ ধ্রু ॥ শিব বাক্য সত্য জ্ঞানে, বিশ্বাস আছে শ্রীচরণে, অবিশ্বাসের হেতু মায়া, ঘটাও তুমি আমার আমি॥ ১॥ ক্ষণে২ দেখাও রঙ্গ, উৎপত্তি প্রলয় ভঙ্গ, না দেখি তার অঙ্গি অঙ্গ, এই রঙ্গে ভ্রমাও ভ্রমি ॥ ২॥ ত্রিগুণে পৃথক হয়ে সদাই থাক লুকাইয়া, তুমি কি সামান্যা মেয়ে, কাম শূন্যা হয়ে কামি ॥ ৩॥ রামচন্দ্রের দিন গত, আসায় আসা বাড়াও কত, ভ্রমিতেছি অবিরত, কেবল মায়ায় হয়ে প্রেমী॥ ৪॥

হলোনা হবেনা আমার, অপরাধ মার্জ্জনা গো ॥ ধ্রু॥ অশেষ প্রকারে তাহা, বিশেষঃ গেল গো জানা । ❋ ॥ হয়ে

ছি পাপির রাজা, মন্ত্রী মন কামাদি প্রজা, লাভ করি রাজ কর, কেবল মাত্র যন্ত্রণা ॥ ১ ॥ মায়া দেশ কর্ম্ম ক্ষেত্র, আপদ নামেতে মিত্র, অধর্ম্ম নামেতে পুত্র, পাটরাণী দুর্ব্বাসনা ॥ ২ ॥ ভ্রমদণ্ড করি করে, কালছত্র শিরোপরে, উদ্বেগ আসনে বসি, দ্বারে অমঙ্গল সেনা ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র নামে গড়ে, কর্ম্ম সূত্র নিশান উড়ে, জ্ঞান শূন্য ডঙ্কা পড়ে, দুর্যশ ভেরী ঘোষণা ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল জলদ তেতালা ॥

কালী কাল ভয় হরা, আমরি কেমন মেয়ে জীব শিব করা ॥ ধ্রুং ॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম, নামে নাশে ধর্ম্মাধর্ম্ম, উপাধি হইলে শূন্য, আপনি দেয় ধরা ॥ * ॥ জ্ঞান কর্ম্ম পরিহর, অন্য চিন্তা দূর কর, কালী বল কালী কর, নয়নের তারা ॥ * ॥ নাথ আজ্ঞা অনুসারে, চিন্তা কর চিন্তাগারে, স্বপনে কি জাগরণে, না হও পাসরা ॥ ১ ॥ কহে রামচন্দ্র নরে, এবার বহু জন্মান্তরে, সকল মানব দেহ, বিফল না করা ॥ * ॥ জ্ঞান ভক্তি সহভাবে, শ্যামা পদ ভাব ভাবে, চিন্তায় চিন্তা দূর হবে, অচৈতন্য তরা ॥ ২ ॥

কালী কেজানে কেমন, যে দেখে যেমন ভাবে সে বলে

তেমন ॥ ধ্রুং ॥ অখণ্ড মণ্ডলা কারে, সে বিরাজে সর্ব্বাধারে, ব্যাপ্ত গুপ্ত চরাচরে, যেখানে যেমন ॥ ✽ ॥ প্রকৃতি পুরুষা কারে, সৃষ্টি স্থিতি লয় করে, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাই, বেদের বিচারে ॥ ✽ ॥ অনন্ত না পায় অন্ত, তাহে নর সদা ভ্রান্ত রামচন্দ্র হয়ে ক্ষান্ত, চিন্ত্য শ্রীচরণ ॥ ১ ॥

রাগিণী টোড়ি ॥ তাল ধিমা তেতালা ॥

হর হৃদি সরোরুহে, কি সুমাধুরী, মরি২ বামা কেরে ॥ ধ্রুং॥ হেরিলে নয়ন মনো, না হয় তারি ॥ ✽ ॥ সকল সুখের নিধি, লজ্জা পায় হেরিয়া বিধি, তথাপি না হয় অবধি, আজন্ম হেরি ॥ ১ ॥ কি কব অধিক আরো, হর হৈলা দিগম্বরো, বস্ত্র মাত্র দিয়া তারো, দাস হয় তারি ॥ ২ ॥ নেত্রে জ্ঞানাঞ্জন জারো, সে জানে সুখ তাহারো, রামচন্দ্র পশু নরো, নয় অধিকারী ॥ ৩ ॥

বিরাজে হৃদয়াম্বুজে, মণি মন্দিরে ওকে তিমির হরে ॥ ধ্রুং ॥ ত্রিপঞ্চারে শিব উরে, মদনাগারে ॥ ✽ ॥ বিহরে আনন্দ ভরে, নিজ তনু না সম্বরে, দিগম্বরী দিগম্বরে, গরবো করে ॥ ১ ॥ সুপ্রসন্না শ্যাম রসে, অলসে না বান্ধে কেশে, ভ্রুভঙ্গী মধুর হাসে, কাম জয় করে ॥ ২ ॥ কামাস্ত

কামের ডরে, ভয়ে হয়ে সবাকারে, দিয়া রাঙ্গা পদ তারে, নির্ভয় করে ॥ ৩ ॥ কহে রামচন্দ্র নরে, যে ভাবে দক্ষিণান্তরে দক্ষিণান্ত করে তারে, সর্ব্বস্ব হরে ॥ ৪ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

মনো নয়ান অন্তরে, সদাই লুকাও গো ॥ ধ্রুং ॥ ভাবিলে না পাই দেখা, এই কি সম্ভবে গো ॥ * ॥ দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলি অন্যে হেরি, থাকিয়া অন্তরে শ্যামা, করো গো চাতুরী। তুমিতো বিষম মেয়ে, কে তোমারে জানে গো ॥ ১ ॥ যেন সূর্য্য প্রতিবিম্বু, প্রকাশয়ে যথা অম্বু, অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু, দেখা নাহি যায়। রামচন্দ্র দর্পণেতে, দেখাও রাঙ্গা পদ গো ॥ ২ ॥

শ্যামা আমার অন্তরে জাগো, কি ঘুমাও গো ॥ ধ্রুং ॥ ভক্তি ধনো করে চুরি, মনো চোরো তায় গো ॥ * ॥ অরাজক এই পুরে, কামাদি ডাকাতি করে, নিত্য বস্তু মাত্র হরে, হইয়া নির্ভয়। না মানে দোহাই তারা কি করি উপায় গো ॥ ১ ॥ সুদৃঢ় বন্ধন করে, কেহ বান্ধে কেহ মারে, উদ্বেগ বিষম বহ্নি, দিয়া দাহ করে। ত্রাহি২ রামচন্দ্র, মরি প্রাণ যায় গো ॥ ২ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ খয়রা বাকওয়ালী তালেন গীয়তাং ॥

যাবি অতি দূর বেলা, হইল ভাব কি বসিয়া, ভয় নাহি রে তু একাকী হইয়া ॥ ধ্রুং ॥ সম্বল হীন তোর লওনারে সম্বল করিয়া, ভবেরো বাজারে মহাজন স্থানে যাচিয়া ॥ * ॥ ডুবিল তপন দেখ, পার হওয়া হৈলো নাকো, এলো মহা কাল নিশি ব্যাপিয়া ॥ ১ ॥ ভব জল জলনিধি, পার হবার এই বিধি, কাল নাম তরণী করিয়া ॥ ২ ॥ আনন্দ পাল উড়াইয়া, কেরোয়াল ভাবে ধরিয়া, ত্বরা করি রামচন্দ্র, দেওনা তরি চালাইয়া ॥ ২ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ কওয়ালী তালেনগীয়তে ॥

কেয়্সে হরকে গুণ গায়োঁ মেই, ঐরী মেরি মনহি ভট্কে, দূষণ মোমন মোহমে আট্কে ॥ ধ্রুং ॥ জনন মরণ করি বাম বালাইয়া, জনম জনম মে বৈরী ভেইলো, হরকে হরে ধ্যান জ্ঞান সব, সগুণ কে সুখ মট্কে ॥ ১ ॥

সারিগম পধনি গায়ে জো, সোয়ী গুণিন্ মে গুণি কহাওয়েঁ নির গুণন্তে সব গুণ উপজাওয়েঁ ॥ ধ্রুং ॥ সুরণ কে সুরঞ্জন

লাও য়েঁ, আপনা ঘটমে রাম জাগাওয়েঁ, ধক্কট্ বি ধি কট্ ধোঁ ধোঁ তাথৈ তাথৈ রঙ্গ জো লাওয়েঁ ॥ ১ ॥

রাগিণী সিন্ধু সারঙ্গ ॥ তাল একতালা ॥

চলিলাম ভাই ভোলার হাটে, ছেড়ে যায় সঙ্গের সঙ্গী দূর ॥ ধ্রুং ॥ কেহ বেচে পুরুষার্থ চারি, কেহ করে ক্রয় যতন করি, ভক্তি ভাব জ্ঞান রতন ভূরি, ভাবির দোকানে প্রচুর ॥১॥ কেহ বেচি গেল পুণ্য পাপ, কেহ করে কেবল কথার আলাপ, কেহ বেচি গেল তৃতীয় তাপ, কেহ অবিদ্যা অঙ্কুর ॥ ২ ॥ দেখ হাটের বেলা হইল ক্ষয়, রামচন্দ্রের এই উচিত হয়, জ্ঞানসহ ভক্তি করিয়া ক্রয়, চলিচল কালীপুর ॥ ৩ ॥

আইলাম ভবে এই করিলাম, এবার হারালেম্ দুকুল ॥ ধ্রু ॥ চিত্র কমল কুড়্যে লেখা, ভ্রমে পড়ি অলির ভাঙ্গিল পাখা, নাপায় গন্ধ মধু তথা, অলির স্থূলে হৈল ভূল ॥ ১ ॥ বিষয় প্রান্তরে মরীচিকা, জলভ্রমে বালি বেড়াই চেখা, প্রাণ যায় পিপাসায় চেকা, নাপেলম নদীর কূল ॥ ২ ॥ বিষম মহা মায়ার এই কল, চিনি ব্যলে খাওযায় নিমের ফল, রামচন্দ্র হত বুদ্ধিবল, তার হারাইল মূল ॥ ৩ ॥

রাগিণী সুরট সারঙ্গ ॥ তাল একতালা ॥

মনরে কালী কালী বলো ॥ ধ্রু ॥ দেহে পাপ পুণ্য, তারে করি শূন্য, গুণময় দেহ ছাড়িয়া চলো ॥ * ॥ অন্তরে অন্তরো, নহে সে তোমারো, তারে নিরন্তর, নয়নে দেখ। এই তো সমাধি, করো নিরবধি, আসিবে উপাধি, মায়ার ফল ॥ ১ ॥ নাম ধ্যান মন্ত্র, কালী নয় স্বতন্ত্র, ভিন্ন ভাবে ভ্রান্ত, নিতান্ত যারা। নিষেধ বিধি দূর, হৈলে কালী পূর, নিকট হবে ভাই, সকালে চলো ॥ ২ ॥ হইয়া চৈতন্য, হবে দ্বৈত শূন্য, কালী নামের এই, আছেরে ফল। রামচন্দ্র কয়, ইথে কি সংশয়, মানব দেহ জনম, সফল হইল ॥ ৩ ॥

মন যদি ভাবিবি কালী ॥ ধ্রু ॥ ভেঙ্গে যাবে বাসা, নাহি হবে আসা, আমার আমি এই, যাবিরে ভূলি ॥ * ॥ ধরা শয্যাসন, দিগেরি বসন, নাগেরি ভূষণ, ছাই মাখিবি ॥ গায় বাঘছালা, গলেহাড় মালা, ভালে শশী, জটায় গঙ্গা কেলি ॥১॥ হবে সর্ব্বনাশ, শ্মশানেতে বাস, ঘরে২ মেগে, খেয়ে বেড়াবি ॥ বিষম পেটের জ্বালা, খাবি ভাঙ্গ হালা, নাচিতে গাইতে, পড়িবি ঢলি ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র গায়, অন্য চিন্তা যায়, আপন চিন্তায়, দেখে সেকালী ॥ নাহি কালাকাল, ভয়করে কাল, হাতে দেখে তাল, কপাল খুলি ॥ ৩ ॥

হৃদয়ে দেখরে কালী ॥ ধ্রু ॥ গেছে ভব ভয়, নাহিক সংশয় মিছা কেন আর, করো ব্যাকুলী ॥ * ॥ তোমার এই ঘটো মহামায়ার পটো, আচ্ছাদন ছিল, তোমারে বলি। শ্রীনাথ করুণা, করিয়া জাননা,ঘুচাইয়াছেন দিয়া, পায়ের ধুলি ॥ ১ ॥ ঘটের বাহির, নহে কালী স্থির, স্থির এই কথা, কয়েছেন শূলী ॥ আগমের কথা,গোপন সর্ব্বথা, স্বরূপ কুলেতে, আছে সে মেলী ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র কয়, চিদানন্দ ময়, সাত্ত্বিক প্রেম, ইহারে বলি ॥ হলে স্থির তর, নাহি কোথাও ডর, সহজে সেখানে, যাবিরে চলি ॥ ৩ ॥

বিষম সর্ব্বনাশি মেয়ে ॥ ধ্রু ॥ করিতারো আশ, শ্মশানে তে বাস, দিগম্বর বেড়ায় মেগে খেয়ে ॥ * ॥ দেখি তারো কায, বেদে পেলে লাজ, গুণগায় তার, কুণ্ঠিত হয়ে ॥ দর শন ছয়, পেলে তারা ভয়,স্থূল হৈল ভুল,গেলো ভুলিয়ে ॥ ১ ॥ অঘটনায় করে, ঘটনা সঙ্গতি, সঙ্গতির গতি, দেয় ভুলিয়ে ॥ প্রকাশিয়া মায়া, কুহকের ছায়া, সদাই থাকে তায়, পৃথক হয়ে ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র কয়, সেতো বিশ্বময়, সর্ব্বস্থানে রয়, কিন্তু লুকাইয়ে ॥ ভোগায় পুণ্য পাপ, নাহি করে মাপ, বলায় দয়াময়ী, কঠিন হিয়ে ॥ ৩ ॥

রাগিণী সোহেনী ॥ তাল একতালা ॥

সামাল শ্যামা ডুবিল তরি ॥ ধ্রুং ॥ ভব তরঙ্গের দেখি রঙ্গ

ভারি ॥ * ॥ কর্ম্ম বাতাস মায়া মেঘে সদাই পড়ে মোহ বারি। চঞ্চলা চপলা ভ্রমে, ঘনো ডাকে ঘটা করি ॥ ১ ॥ ভাঙ্গিল মাস্তুল মন সুকর্ম্ম বাদাম গেল পড়ি। তরী গরোক হয় আবর্ত্ত কামে, পাপের ভরায় হয়ে ভারি ॥ ২ ॥ জ্ঞান সূর্য্য অস্ত হৈল অজ্ঞান তিমির ঘেরি। একুল ওকূল দুকূল পাথার, হত হৈল বুদ্ধি দারি ॥ ৩ ॥ ভেবে ধন্দ রামচন্দ্র, উপায় শূন্য হৈল তারি। করুণা নোঙ্গর কর তায়, কর্ণধার করুণা করি ॥ ৪ ॥

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না ॥ ধ্রুং ॥ ভাল পেয়েছোরে ভবে কাল বিছানা ॥ * ॥ পেয়েছ সুখ শর্ব্বরী জেনেছো কি ভোর হবে না। তোর কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফিরোনা ॥ ১ ॥ অসার চাদর দিয়াছ গায় মুখ ঢেকে তায় মুখ খোলানা। শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, ধোবার ঘরে তায় কাচোনা ॥ ২ ॥ খেয়েছ বিষয় মদ সেমদের আর ঘোর ঘোচেনা। দিবানিসি মুদে আঁখি, অলসে প্রকাশ পায় না ॥ ৩ ॥ অতি মন্দ রামচন্দ্র ঘুমাইয়া আসা পুরে না। তোর ঘুমে মহা ঘুম হইবে, ডাকিলে চেতন পাবে না ॥ ৪ ॥

রাগিণী সুরট জয়জয়ন্তী ॥ তাল ঝাঁপতাল ॥

ষট্‌চক্র বর্ণনা ॥

কালী কুণ্ডলী রূপা কাম পীঠান্তরে, বিহরে স্বয়ম্ভূ নাম

লিঙ্গোপরি মূলাধারে ॥ ধ্রুং ॥ ত্রিগুণা সুসুম্না নাড়ী মেরু দণ্ডান্তরে, দক্ষে সব্যে বহি, পিঙ্গলা ঈড়া শিরে ॥ * ॥ সুসুম্না অন্তরে বজ্রিণী শোভা করে, তন্মধ্যে চিত্রিণী ব্রহ্ম নাড়ী গর্ব্ভে ধরে, দ্বার ব্রহ্মাখ্য মুখে মোক্ষ পথ গোপিনী, সুপ্তা অহি রাজ রূপা, সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে॥ ১ ॥ বিশ তন্তু ময়ী রুচি কোটি সৌদামিনী, শ্বাস উচ্ছ্বাস ক্রমে জগত জীব ধারিণী, নিন্দি মত্তঅলি রব বৈখরী নাদিনী, কাব্য রস নব্য করি, নবধা সে ভেদ করে ॥ ২ ॥ আরক্ত কনকচল রূপ স্বয়ম্ভূ শিব, লিঙ্গরূপে পানকরে কুণ্ড গোলোদ্ভব, পূর্ণেন্দু বিম্বকরো সন্তান হাসী, কাশীপুর বাসী, বিলাসী ত্রিপুর পূরে ॥ ৩ ॥ পৃথ্বী বীজ মূর্ত্তি ধরি বসিয়া গজেন্দ্রোপরি, অঙ্কে বালার্ক রুচি ব্রহ্মা শিশু সৃষ্টি করী, কন্দর্প বায়ু সহ জীবেশ মায়ামোহ, যত্র কুল ভৈরবী, ডাকিনী বাস করে ॥৪॥ গলিত সৌবর্ণ রুচি মূল পঙ্কজ শোভা, তত্র বসন্ত চারি পত্রে রক্ত প্রভা, ভেদী ষট পদ্ম লয়ে হংসী হংসাগারে, ধন্যনর ধরণী তলে, ধ্যানে সঙ্গতি করে ॥ ৫॥ নাম স্বাধিষ্ঠানে আরক্ত মহোৎপলে, লাজে চপলা রুচি বল অন্তষড়্দলে, অর্দ্ধেন্দু বংকারে বরুণ মকরাসনে, অঙ্কেবিষ্ণু স্তথা, রাকিনী সহ কারে ॥ ৬ ॥ ত্রিকোণ মণি পূরকে মেঘ রুচি পুষ্করে, দিগ দলে ডফ অন্ত নীল কান্তিধরে, রক্তাক্ত বহ্নি বীজ মূর্ত্তি ধরি

মেঘোপরি, লাকিনী ভৈরবী, বৃদ্ধ রূপ রুদ্র ঘরে ॥ ৭ ॥ বন্ধু জীব কান্তি ষট্ কোণ অনাহতে, দ্বি ষড়দল মধ্যে কঠান্ত রক্তার্চ্চিতে, ধূম্রুচি বায়ুবীজ কৃষ্ণ সারোপরি, ভৈরবী কাকিনী, বাণাখ্য লিঙ্গ পুরে ॥ ৮ ॥ পদ্ম বিশুদ্ধ নাম ধূম রুচি বিম্বাকারে, শোভে ষোড়শ দলে স্বর বর্ণ রক্তাকারে, হিমচ্ছায়া নাগোপরি বিষ্ণু আসন করি, অঙ্কে হর গৌরী, শাকিনী নারী তত্রপুরে ॥ ৯ ॥ দ্বিদলে হক্ষাক্ষরে আজ্ঞা পদ্মান্তরে, যোনি পীঠে সূক্ষ্ম শিব লিঙ্গ রূপাকারে, চন্দ্র বীজান্তরে পীযূষ সঞ্চরে, হাকিনী ভৈরবী, মনোহি ভ্রূমধ্য ঘরে ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রান্তরে সরসীরুহ সংপুটে, হলক্ষ অক থাদি সূর্য্যদলে হংস পীঠে, নাথ সহ রহসি কালী শাম রসানন্দভরে, সাধ্যনহে এইরূপে, চিন্তে রামচন্দ্র নরে ॥ ১১ ॥

রাগিণী সুরট ॥ তাল আড়া ॥

সকলি শ্যামা মা আমার, ইচ্ছায় পুরুষ হন করিতে বিহার ॥ ধ্রুং ॥ আগম নিগম উক্তি, নাহি তার দ্বিতীয় মূর্ত্তি, নামরূপ ভেদে স্ফুর্ত্তি, অনেক তাহার ॥ * ॥ ব্রহ্ম সনাতনী আদ্যা, আদি মহাকাল সাধ্যা, একধা দশধা মহাবিদ্যা নাম তার । নির্গুণা সগুণা বটে, প্রকৃতি পুরুষ বটে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ময়ী, আধের আধার ॥ ১ ॥ অখণ্ড মণ্ডলাকারে,

ব্যাপ্ত গুপ্ত চরাচরে, যে পদ দেখাইলা যারে, সেপদ দেখ তার। এইতো কহিলা বেদ, ইহাতে মূর্খের খেদ, তত্ত্ব জানিয় নাহিভেদ, কালী কালা তার॥ ২॥ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি, ভেদে হয় অবিদ্যা মূর্ত্তি, সেই ত্রিগুণ প্রকৃতি, মায়ানাম তার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবময়, আদি নারায়ণ হয়, অংশী অংশ কলায়, সেতো নানা অবতার॥ ৩॥ হইয়া কুণ্ডলী শক্তি, মূলাধারে করি স্থিতি, অজপায় ধারণ করেন, জীব নাম সার। রামচন্দ্রে করিদয়া, নাশমা অবিদ্যা মায়া দিয়া রাঙ্গা পদছায়া, দেখাও গোসহস্রার॥ ৪॥

কালী কি সামান্যা মেয়ে, পঞ্চ প্রেতে প্রেতাসন রয় মাথায় করিয়ে।॥ ধ্রুং॥ যার যন্ত্র সুধা সিন্ধু, আনন্দ তার এক বিন্দু, পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী শিব, গরল খাইয়ে॥ * ॥ সুরপুর সন্নিধানে, কদম্ব কুসুম বনে, স্থান মণিদ্বীপনামে, চিন্তামণি গৃহে। শবাকার মহা মঞ্চে, পর শিব পরিজঙ্কে, বিহরে রহসি কালী, মুক্তকেশী হয়ে॥ ১। শ্যামা মা মানস চরী, চিদ ঘনানন্দ লহরী, ঘটে২ বাসকরি, আপনি লুকায়। ভক্তে ধন্য নরে তারে, অন্যে কি লক্ষীতে পারে, ভাবে রামচন্দ্র, অন্ধ পথ হারায়ে॥ ২॥

কি কায আর সাধনে, হৃদয়ে দেখরে কালী বল

বদনে ॥ ধ্রুং ॥ সাধনেরি বহু অঙ্গ, ত্যাগ করি সত সঙ্গ, প্রসঙ্গে কালীর গুণ, করো শ্রবণে ॥ * ॥ তীর্থাটন পরিশ্রম, কেবল মনেরি ভ্রম, সর্ব্বতীর্থ কলকালী, পদতল ধাম। রাম চন্দ্রের অভিলাষ, হবে যদি কালিদাস, করো পদরজ আশ, বাসনা মনে ॥ ১ ॥

কিকাল ঘরে প্রবেশিল, ভাবিতে একাল গেল সেকাল আইল ॥ ধ্রুং ॥ কালীপদ না চিন্তিলেম্, কালের বশে কাল্ হারাইলেম্, ভালকাল পেয়েকাল, সকলি হরিল ॥ * ॥ কালে কাল লীন হবে, কালে সকলি নাশিবে, রবে মহা কাল কেবল, কালী পদাশ্রয়ে। কালীর করুণা বিনে, উপায় নাহিক আনে, রামচন্দ্র মিছা লুব্ধ, আশায় রহিল ॥ ১ ॥

রাগিণী মুলতান ॥ উক্ত তালেন গীয়তাং ॥

ভাবরে২ মন শ্রীনাথ চরণ, মুক্ত হবি এবার যদি এভব বন্ধন ॥ ধ্রুং ॥ তোমারে করিয়ে দয়া, সে দিয়াছে পদ ছায়া, অনিত্য বিষয় মায়া, কর কিকারণ ॥ ১ ॥ বিকায়েছ যার পায়, না দিলি দোহাই তায়, কি করিলি হায় হায়, ধিকরে জীবন ॥ ২ ॥ কহে রামচন্দ্র নর, গুরু পদাশ্রয় কর, কেন মায়াশ্রয়ে মর, না বুঝি কারণ ॥ ৩ ॥

চলোরে চলো যাই, মনো আনন্দ কানন ॥ ধ্রুং ॥ হংস পিঠে শ্রীনাথ পদ, করি দরশন ॥ * ॥ জ্যোতির্ম্ময় মহারম্য, নহে বেদ-বিধিগম্য, চন্দ্রসূর্য্য গতি শূন্য, দহন পবন ॥ ১ ॥ পরম আনন্দ ধাম, ব্রহ্মানন্দ পরিণাম, নিবৃত্তি সকল কাম নাই জরা মরণ ॥ ২ ॥ কহে রামচন্দ্র ভাবি, পরম আনন্দ পাবি, নিত্য সুখে চলে যাবি, দেখি শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

ধনা শ্রীরাগিণ্যাং ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

ভাবরে পরমা পদ পরম আদরে। অন্তর্যাগে সাধ তারে ভাবেরো মন্দিরে ॥ ধ্রুং ॥ হৃদি পদ্মে ত্রিপঞ্চারে, সবাকারো শিরাধারে, মহাকাল উরে সেতো, গোপনে বিহরে ॥ * ॥ অমায়া অনহঙ্কার, অব্যগ্র অরাগ অমৎসর, অমদ অমোহ অলোভ অক্ষোভ অদ্বেষ আর। অহিংসা কুসুম সার, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, জ্ঞানদয়া ক্ষমা পঞ্চদশ, পুষ্প দ্বারে ॥ ১ ॥ হৃৎপদ্মে দিয়া আসন, সুস্বাগত বাক্য দান, সহস্রার চ্যুতামৃতে পাদ্যের বিধান। মনোঅর্ঘ্য নিবেদন, তত্ত্বামৃতে আচমন, স্নানীয় তাহাতে মধুপর্ক, ষোড়শারে ॥ ২ ॥ অম্বরং দিয়া জ্ঞানভূষণে ভূষিয়া, গন্ধ গন্ধ তত্ত্ব চিত্ত পুষ্প প্রকল্পিয়া। পঞ্চ প্রাণো ধূপ কর, তেজদীপে ধ্বান্ত হর, অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, বাজাবে তৎপরে ॥ ৩ ॥ সুধাম্বুধি সহস্রারে নৈবেদ্য

দিয়া তাহারে, কাম ক্রোধ অজা বাহ বলি কর তারে। শব্দ তন্ত্র স্তুতি গীত, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম তার নৃত্য, ভাব ত্রয়ে পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় দিয়া তারে ॥ ৪ ॥ অকারাদি লকারেতে অনুলোম বিলোম রীতে, ক্ষকার সুমেরু করি গাঁথ কুণ্ডলীতে। বর্ণাষ্টক অন্ত্যাক্ষর, অষ্টোত্তর শতবার, বর্ণমালা জপমন্ত্র, দিয়া তার অন্তরে ॥ ৫ ॥ জ্ঞানেতে চৈতন্য কর নাভিকুণ্ডে বৈশ্বানর, আত্মা বহ্নি ঐক্য ভাবে, মন স্রুব কর। সমিধ তায় ধর্ম্মা ধর্ম্ম, হবিতায় সঙ্কল্প কর্ম্ম, পূর্ণাহুতি দিবে মায়া, বহ্নি জায়া স্বরে ॥ ৬ ॥ দক্ষিণায় দক্ষিণা হবে যে কিছু সম্পদ রবে, পূজা সাঙ্গে এবার ভবে আরো না আসিবে। কহে রামচন্দ্র নর, সর্ব্বদা এই কর্ম্ম কর, সাধন কি কথার কথা, মুক্ত ভবান্তরে ॥ ৭ ॥

আছ শ্যামা মা আমার অনাহত ঘরে, দ্বাদশ দলেতে সদা কণ্ঠান্তে বিহরে ॥ ধ্রুং ॥ ঈড়া নাড়ী স্থিতা বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণ ধামে, সুষুম্নাত্রিগুণা মেরুর, অন্তর অন্তরে ॥ * ॥ ষট্ কোণ আকার তার বন্ধুক কুসুমাকার, যমিতি বায়ুবীজ তায় ধূম্রবর্ণ যার। বাণাখ্য শিবলিঙ্গ তায়, কনক রুচির কায়, কাকিনী চঞ্চলা রূপা, কৃষ্ণারোপরে ॥ ১ ॥ মূলাধারে ত্রিকোণেতে বামাস্তে চারি দলেতে, লমিতি ধরাবীজ তায় লিঙ্গিয়া শোণিতে। নবীন সূর্য্যের অংশু, জিনিয়া পরম শিশু

ডাকিনী ভৈরবী শক্তি, গজোপরে ॥ ২ ॥ বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখে ত্রিকোণাখ্যে পুরে সুখে, বিলসে কন্দর্প বায়ু জীব যার সম্মুখে। স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরে, বেষ্টিত ভুজঙ্গাকারে, বিহরে কুল কুণ্ডলী, ব্রহ্ম দ্বারোপরে ॥ ৩ ॥ অর্দ্ধ ইন্দু আকারেতে ধ্বজের মূল দেশেতে, বসিতি বরুণ জীব সিন্দূর মণ্ডিতে। ষড় দল বল অন্ত, মকরাসনে উপাস্ত, রাকিণী ভৈরবী সহ, ত্রিবেণীর তীরে ॥ ৪ ॥ নাভিমূলে ডক অন্তে রমিতি বহ্নি বীজেতে, পূর্ণ মেঘদ্যুতি হরে, ত্রিকোণাকারেতে। বৃদ্ধ রুদ্ররূপী শিব, সিন্দূর বরণ রাগ, লাকিনী ভৈরবী সহ, মেঘের উপরে ॥ ৫ ॥ বিশুদ্ধে বর্ত্তুলাকারে ধূম্রাভা আকাশোপরে, রক্তবর্ণ সোণস্বরে আছো ষোড়শারে। বিষ্ণু শুক্লাম্বর ধারী, শাকিনী নামেতে নারী, কোলে দোলে হরগৌরী, নাগের উপরে ॥ ৬॥ অজ্ঞাচক্রে যোন্যাকারে হক্ষবর্ণ তদুপরে, ঠমিতি চন্দ্রবীজ তায় অমৃত সঞ্চারে। লিঙ্গরূপী শিবেমেলি, হাকিনী ভৈরবীর কেলি, সকল ইন্দ্রের রাজা, মনো বাস করে ॥ ৭ ॥ দ্বিদল উর্দ্ধে মহাশূন্য জ্যোতির্ম্ময় মহারম্য, পূর্ণ ভগবানের স্থিতি যে ভাবে সেধন্য। প্রণব সহ স্থির বায়ু, যোগী রাখে যোগে আয়ু, মহানাদ রূপী শিব, অর্দ্ধকার ধরে ॥ ৮ ॥ অকথাদি ত্রিরেখান্তে দ্বাদশ দলের অন্তে, পরম শিবের সহ মিলিয়া একান্তে। সহস্রারে আছ ঢাকা, ভাবিলে ভাবী পায় দেখা, রামচন্দ্র শিবের লেখা, বুঝিতে কি পারে ॥ ৯ ॥

আরে আমার মনরে কাচিন্তা তোমারে, দেখরে শ্রীনাথ পসারি তোমার ভবের বাজারে॥ ধ্রুং॥ শ্যামানাম চিন্তামণি, নাথ দিয়াছেন আপনি, অমূল্য রতন ধন,ব্যাপারের তরে॥ *॥ ব্যাপারী যতেক আছে, বেচাকেনা তারি কাছে, দ্বিগুণ ব্যাপার করি, গোলদার হয়েছে। চিন্তামণি পুঁজি তব, ব্যাপারে সুগম শব, বৈসরে ব্যাপার কর, আপনার ঘরে॥ ১॥ হইয়া ব্যাপারী দড়, বুঝিয়া ব্যাপার কর, সম্ভাষিয়া মহা জনে, কেনো সওদা তার। লেনা দেনা সূক্ষ্ম কর, কমির আশা পরিহর, বাঢিবে পুঁজি তোমার, কহে রাম নরে॥ ২॥

আরে আমার মনরে ভব পারাবারে, নিস্তার ঘাটে তরণী বান্ধা রয়েছেরে॥ ধ্রুং॥ শ্রীনাথ কাণ্ডারি যাতে, কিছু ভয় নাহিতাতে, করিয়া সাহস তাহে, চড়োগে সত্বরে॥ *॥ নিবৃত্তি নামেতে তরী, দুর্গমেতে চলে ভারি, নির্গুণেতে থাকে বান্ধা, শূন্য তাহে দাঁড়ি। মানস বাতাসে চলে ইচ্ছাময় পাল তোলে, কখনসে নাহি টলে, বিষম পাথারে॥ ২॥ নাম রত্ন ধন কত, খাবি যতো পাবি তত, অতিদূরে যাবি কিন্তু, যেতে যাবি ত্বরা। যখন যথা আরাম, সেখানে পাবি বিশ্রাম, সর্ব্বদা তায় শুভক্রম, কহে রামনরে॥ ২॥

গিরিরাজহে আনিতে উমারে, কে যাবে পাঠাব

কারে, কৈলাস শিখরে ॥ ধ্রুং ॥ শত পুত্র হৈল নষ্ট, মৈনাক সকল জ্যেষ্ঠ, অবশিষ্ট ছিল সেত, গত সিন্ধুনীরে ॥ * ॥ দেবর্ষি নারদ আসি, মম সন্নিধানে বসি. কহিল যেসব কথা কিকব তোমারে। ভিখারি দুহিতার পতি, সদাই তার অস স্তুতি, লম্বোদর সেনাপতি, সুত যার ঘরে ॥ ১ ॥ গত নিশি অবসানে, উমারে দেখি স্বপনে, ডাকে মৃদুস্বরে আমায়, মা আছগো ঘরে। পিতা মাতা আছে যার, তারকি এই ব্যব হার, আপনি আসিতে নারি, লোক লজ্জা ডরে ॥ ২ ॥ শরদে শারদা বিনে, কিরূপে বুঝাব প্রাণে, কহ কহ গিরি বর, কে আছেহে ঘরে। বিশেষে মায়ের বা বা আছে ধারণ, অবশ্য আসিবেন উমা, সংবৎসর পরে ॥ ৩ ॥ বিষাদে বিষাদ করে, মেনকা না ধৈর্য্য ধরে, অচল সচল হয়ে চলিলা সত্বরে। কহে রামচন্দ্র দ্বিজ, তিলেক নাসহে ব্যাজ, যে জানে সে জানে দুর্গা, জাগে যার অন্তরে ॥ ৪ ॥

ওহে নগরাজ হে রহিতে নারিঘরে, শরদে শারদা বিনা হৃদয় বিদরে ॥ ধ্রুং ॥ আনুছান্ করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী যেন, ব্যাকুলা অন্তরে ॥ * ॥ সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঞ্জন, অঞ্চলে রতন নিধি, বিধি দিল মোরে। কি বলিব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ পারাবার সদা, উথলে অন্তরে ॥ ১ ॥ নারদে

বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার শুনি দুখ, সৈতে নাকি পারি। জনক ভূপতি যার, দুখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার রত্নাকর, বাস হিমঘরে ॥ ২ ॥ শ্মশানে জামাতারঘর, ভস্ম ভূষা দিগম্বর, ভূত প্রেত পরিবার, শিরে গঙ্গাধরে। তনয়া রাজকুমারী, তার কি সম্ভবে নারী, শুনি তায় মাথায়, ভস্ম দিগম্বরী করে ॥ ৩ ॥ বন্ধুহীন কুলাচারে, কন্যা দিলাম অবিচারে, জামাতা মমতাশূন্য, ভুলিলা দুর্গারে। মেনকা বাৎসল্যে ভাবে, চলিলা হিম কৈলাসে, রামচন্দ্র ঐ আশে, ডাকয়ে দুর্গারে ॥ ৪ ॥

সিন্ধুরাগিণী ॥ তাল আড়া ॥

দুর্গাকি ভুলিলি মাগো আমারে এবার, উন্মাদিনী কান্দে রাণী, বলে অনিবার ॥ ধ্রুং ॥ স্বপনে কি জাগরণে, জাগে দুর্গা যার মনে, দুর্গা বিনা মনোদুঃখ, কে জানিবে তার ॥ ১ ॥ রাণী অনিমিখে চায়, কৈলাসের প্রতিধায়, শরদের দিন যায়, ভাবে বারবার ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র দীনে ভাষে, দুর্গাপদ রজ আশে, দুর্লভ মানব তনু, হইবেকি আর ॥ ৩ ॥

আনিতে বিলম্ব কেন হইল রাজার, কে যাবে আনিবে উমাঁর শুভ সমাচার ॥ ধ্রুং ॥ শরদের দিনগত, মনেরে

বুঝাব কত, দুর্গাকে করিবে জ্ঞাত, যে দুখ আমার ॥ ১ ॥ দুখিনী জননী ব্যলে, দুর্গা যদি গেল ভুলে, মহেশ যে ভোলা ছেলে কি দোষ তাহার ॥২॥ গত প্রায় শরদ কাল, রামচন্দ্রের দিন গেল, দুর্গা যদি করো ছল, কে করে উদ্ধার ॥ ৩ ॥

ললিত রাগিণ্যাং ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

যাবহে নিশি প্রভাতে, হিমালয় এসেছেন আমায় লইতে ॥ ধ্রুং ॥ পতি আশুতোষ যার, দোষ গুণ তুল্য তার, তথাপি শ্রীমুখ আজ্ঞা, বিনাকি পারি যাইতে ॥ * ॥ কি কব জননীর দুঃখ, বিধি তারে বৈমুখ, ছলে শতপুত্র তার, হরিল তাবত। মাবলিতে নাহি ঘরে, সে দুখ কহিব কারে, বিদরিয়া যায় হিয়া, মায়েরে মনে করিতে ॥ ১ ॥ আছে পিতা মাতা যার,সেজানে যন্ত্রণা তার, অনাদি পুরুষ তুমি, নাহিক তোমার। হত পুত্রা মম মাতা, তুমিত তারি জামাতা, এইত উচিত হয়, যাই চল দুজনাতে ॥ ২ ॥ পুরুষ রতন তুমি, তোমায় কি কব আমি, আমার যে দোষ গুণ, সকলি বিদিত। নিবেদন রাঙ্গাপায়, অবিলম্বে দিন যায়, অনুমতি কর হর, জনক ঘর যাইতে ॥ ৩ ॥ অনুমতি দিলা হর, যাইতে জনকঘর, আনন্দে আনন্দ ময়ীর, আনন্দ অন্তর। কহে রামচন্দ্র নর, বিলম্ব কি আছে আর; অচল চলহে চল, দুর্গা লয়ে কৈলাস হইতে ॥ ৪ ॥

কালাংড়া রাগিণী ॥ তাল আড়া ।

এলেগো এসোগো দুর্গা মঙ্গলা আমার, দুখ দূরেগেল হেরি বদন তোমার ॥ ধ্রুং ॥ তাপের তাপিত দেহ দহে নিরন্তর, শীতল কর গো দুর্গা মাবলে একবার ॥ ❋ ॥ অনেক সাধের তুমি তোমার লাগিয়া, করেছি কঠোর তপ বিধি আরাধিয়া, কুলদ্বয়ানন্দকরী তুমি গো আমার, নয়ন পুথলি দুর্গা, প্রাণের আধার ॥ ১ ॥ সংবৎর আছি আশা পথ নিরখিয়া, আজুসে পূরিল আশা ওমুখ চাহিয়া, উথলিল আনন্দের সুখ পারাবার, নাহি উপরম তার, বাড়ে অনিবার । ২॥ মঙ্গলারে মঙ্গলিয়া লয় শ্রীমন্দিরে, আনন্দের নাহিকওর হিমালয় পুরে, আনন্দময়ী নন্দিনী ভবনে যহার, সকল সুখের নিধি, বিধি দিল তার ॥ ৩॥ সার্থক জীবন তার সেদেহ ধারণ, শরদে শারদা পদ করে আরাধন, কহে রামচন্দ্র দ্বিজ জন্ম নাহি তার, শিব উক্ত সেই মুক্ত, ঘুচিল সংসার ॥ ৪ ॥

বাগেশ্রী কানেড়া ॥ তাল মধ্যমান ॥

আজকি আনন্দ, গিরীন্দ্র, আনন্দময়ী ভবনে ॥ ধ্রু ॥ সবদুখ দূরেগেল, বিধি নিধি মিলাইল, সৌভাগ্য উদয় হল, মঙ্গলার আগমনে ॥ ❋ ॥ শরদে শারদা উমা, প্রসন্ন যে

দশ দিশা, সুপ্রকাশ হয়েছে নিশা, স্বচ্ছন্দ হৃদয়। আনন্দ ময়ীরে হেরি; সব শোক পরিহরি; মহা-সুখী নর নারী, সুযতন দরশনে ॥ ১ ॥ ভুবনে সৌভাগ্য যার, বিল্বদল সহকার, রক্ত জবা গঙ্গাবার, দিল শ্রীচরণে। সার্থক জীবন তার, মুক্ত ভব কারাগার, ভবে না আসিবে আর, কহে রামচন্দ্র দীনে ॥ ২ ॥

গিরি উমা সঙ্গে, প্রসঙ্গে, আনিলা ঘরে কার মেয়ে ॥ ধ্রুং ॥ সর্ব্বদেব তেজ দেহ, জটা জুট শিরোরুহ, আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে ॥ * ॥ কনক চম্পক দামা, অতসী কুসুমোপমা, এই না কি সেই উমা, সংশয় আমার। উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হৈল, হিম গিরি সত্য বল, কর ছল পতি হয়ে ॥ ১ ॥ দেখি একি বিপরীত, পদে জম্ভাসুর সুত, তারে করে অস্ত্রাঘাত, উমা কি আমার। আর একি চমৎকার, পদে মহা সিংহ তার, সঙ্গে শূর পরি বার, এল দেব কন্যা লয়ে ॥ ২ ॥ রক্ত জবা বিল্বদলে, পূজে স্বর্গ মহীতলে, তারে গিরি কন্যা বলে, ভাব চমৎকার। দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুনহে নগেন্দ্র রাণী, এইত তব নন্দিনী, ভাবে লও সম্বরিয়ে ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

হেরিয়ে হরগো দুর্গা দুর্গতি আমার, তুমি মহামায়

তব মায়ায় দহে নিরন্তর ॥ ধ্রুং ॥ অনাদি কুকর্ম্ম যোগ, তাপত্রয় করি ভোগ, না হয় শান্তি ভব রোগ, মহিমা মায়ার । * ॥ যদ্যপি অনাদি সিদ্ধ, জীব সে অবিদ্যাবাধ্য, নাহিক জীবের সাধ্য, করিতে উপায় । তোমার ইচ্ছা প্রবলা, সৎসঙ্গে হয় মেলা, সেইতো ভবের ভেলা, আশ্রয়ে উত্তীর্ণ কর ॥১॥ তুমি কর্ত্রী আমি দাস, কইতে হয় উপহাস. নিবেদনে নাহি ত্রাস, কলঙ্ক তোমার । রামচন্দ্র পশু নর, তারে অঙ্গী কার কর, দিয়ে দাস্য কর্ম্মে ভার, তার আপন কিঙ্কর ॥ ২ ॥

রাগিণী সুরট ॥ তাল আড়া ।

বল মা হরের ঘরে, কেমনে আছিলা দুর্গা কৈলাস শিখরে ॥ ধ্রুং ॥ জামাতার নাই ধন, ফণি মণি আভরণ, প্রতিদিন ভিক্ষাটন, কোচনী নগরে । * ॥ বসন অভাবে হর, হয়েছেন দিগম্বর, কখন২ পরে শার্দ্দূল অম্বর । চিতা ভস্ম কলেবরে, বিষ চিহ্ন কণ্ঠে ধরে, সপত্নী তোমার তারে, ধরিয়াছে শিরে ॥ ১ ॥ মেনকা বাৎসল্য জ্ঞানে, ব্রহ্মময়ী নাহি জানে, আপন কন্যা করি মানে, দুর্গারে নিশ্চয় । রাম চন্দ্র এই ভাষে, দুর্গা পদরজ আশে, জন্মে২ দাসের বাসে, দেখা দিয় তারে ॥ ২ ॥

রাগিণী বারওয়াঁ ॥ তাল ঠুংরি ॥

যাবি কি ভবনদী পার, পামর মন আমাররে, নাই দুকূলে তরণী তার ॥ ধ্রুং ॥ নাহি তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ, কাটে দুইধার ॥ * ॥ চৌদিগে গগন ঘটা, হয়েছে আমার, কর্ম্ম মন্দ রামচন্দ্র সন্ধ্যা হল তার ॥ ১ ॥

বিরাজে শ্যামা হৃদয়ে যার, শত দলেরে, কি কায আর সাধনে তার ॥ ধ্রুং ॥ সদানন্দে সদানন্দ ময়ীর বিহার ॥ * ॥ দ্বৈত শূন্যে চিন্তা শূন্য হয় নিরাকার, নাহি মানে ভুক্তি মুক্তি ভক্তি অঙ্গীকার ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মে কর্ম্মে নাহি করে পুরস্কার, রামচন্দ্র তারিসঙ্গে হবে মায়া পার ॥ ২ ॥

কালো রূপ নয়নেতে যার, লাগিলরে, গেছে ধরমা ধরম তার ॥ ধ্রুং ॥ অন্তর বাহিরে হরে মায়া অন্ধকার । * ॥ ব্রহ্মানন্দ আদি সুখ নিছনী তাহার । দেখিয়া মাধুরী তারি মন ভুলে ভোলার ॥ ১॥ রামচন্দ্র কর্ম্ম বন্ধ জাবি মায়া পার, কেমনে অমূল্য নিধি দেখ অনিবার ॥ ২ ॥

রাগিণী ইমন্ ॥ তাল আড়া ॥

কালী এই কুজনে ভবে করগো নিস্তার । জননী আমার

তুমি আমিতো তোমার ॥ ব্রহ্মাণ্ডে অধমাধম, কে আছে গো মম সম, জন্মাবধি অপরাধী, কে লইবে ভার ॥ * ॥ কি করিতে কি করিলাম, কেনবা ভবে আইলাম, ক্ষণমাত্র না চিন্তিলাম, ও পদ তোমার। নিবৃত্তি করিতে আসা, সে আশায় বাড়িল আশা, ওপদ বিনা ভরসা, না দেখিগো আর ॥ ১ ॥ কুপুত্রে কখন মাতা, না করেন করুণান্যথা, লোক বেদ সিদ্ধ কথা, আছে গো প্রচার। পাদপদ্মে দিবা স্থান, পাবে রামচন্দ্র ত্রাণ, যখন হবে অবসান, প্রার্থনা তাহার। ২ ॥

মন পরমানন্দ হবিরে যদি, পরানন্দময়ী ভাবি নিরানন্দে হওরে বাদী। ধ্রুং ॥ যোগারূঢ় যোগযুঞ্জ, কররে তাহারি সঙ্গ, জানিবি সকল রঙ্গ, কে আদি অনাদি ॥ * ॥ তুমিতো অনাদি সিদ্ধ, অনাদি অবিদ্যা বাধ্য, না করিলে সাধ্যারাধ্য, গতি নাহি আর। রামচন্দ্রের এই উপায়, সর্ব্বস্ব দক্ষিণা পায়, দিয়া কেবল ভাব তায়, আপনার হৃদি ॥ ১ ॥

আমি কি হেরিলাম শ্যামা দলিতাঞ্জনী, নয়ন নির্ম্মল করে মন রঞ্জিণী ॥ ধ্রুং ॥ কোটি শশিকান্তি মসী, সুস্থিরা চপলারাশি, দিগ্বাসী মুক্তকেশী, কে রূপসী শবাসনী ॥ * ॥

প্রফুল্ল নীলকমল, নয়ন ত্রয় নির্ম্মল, প্রভাত রবি মণ্ডল. অন্ত রে তাহার। কামের কার্ম্মুক লাজে, আকর্ণ ভ্রূযুগ রাজে, মনসিজে মোহে শিবে, চারু হাসিনী ॥ ১ ॥ শ্রুতি মূলে শব শিশু, কপালে, অর্দ্ধ হিমাংশু, চরণকর নখরে পূর্ণেন্দু উদয়। সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ করে, বরাভয় মুণ্ড ধরে, নর শির হার উরে, নর কর কিঙ্কিণী ॥২॥ শ্যামাপদ কোকনদ, ত্রিলোকের সম্পদ, নীলকণ্ঠ হৃদি হ্রদ, আধার তাঁহার। বিহরে আনন্দ ভরে, নিজতনু না সম্বরে, রামচন্দ্র চিন্তাগারে, রতিপতি বিড়ম্বিনী ॥ ৩ ॥

আমি কি হেরিলাম শ্যামা দলিতাঞ্জনী, নয়ন নির্ম্মল করে মনোরঞ্জিণী ॥ ধ্রুং ॥ অসম্ভব ঘন ঘটা, লজ্জিত দামিনী ছটা, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেটা, কার রমণী ॥ ❋ ॥ সুধাকর অর্দ্ধ ভালে, শব শিশু শ্রুতিমূলে, ন্যক্কৃত মকরাকৃতি, মণি কুণ্ডলে। বালার্ক নয়ন কোণে, হয়েছে আসব পানে, ভ্রূভঙ্গী ভঙ্গিমা অতি, নব রঙ্গিণী ॥ ১ ॥ কুন্দ পুষ্প দর্প নাশে, হাসে দন্ত সুপ্রকাশে, খগপতি চঞ্চু আশা, নাসা বিনাশে। কেশর কুসুম প্রায়, বেসর দুলিছে তায়, ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব হরে, মৃদুভাষিণী ॥ ২ ॥ বিগলিত কেশ জালে, পতিত চরণ তলে, মুক্তা মালা মুণ্ড মালা, লম্বিত গলে। নাশে দাড়িম্বের দম্ভ, উচ্চ কুচ করি কুম্ভ, ত্রিবলী নাগিনী নাভি, সরোগামিনী ॥ ৩ ॥

করি কর গর্ব্ব হরে, শোভা করে চারি করে, মুণ্ড চণ্ড বিম্ব অসি, চপলা আদরে। বরা ভয় করি করে, ডাকে সুরাসুর নরে, দিগবাসী কামহাসী, মনোমোহিনী ॥ ৪ ॥ কেশরি নিন্দিয়া কটি, শব কর পরিপাটী, রচিত কিঙ্কিণী বর, ভ্রমর বধূটী। নিতম্ব বিশাল ভাল, হেরি ভুলে মহা কাল, জানুজঙ্ঘ কাম শঙ্খ, দম্ভ দলিনী ॥ ৫ ॥ নব ইন্দীবর পদ, পদতলে কোক নদ, নখরে লজ্জিত কোটি, চন্দ্রের সম্পদ। মরকত মণি কায়, নূপুরের ধ্বনি তায়, ভাগ্য মন্দ রামচন্দ্র, শ্রবণ বঞ্চিনী ॥ ৬ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ খয়রা তালেন গীয়তাং।

শ্যামা চরণ কেমনে পাবি মন, শিব শব হৃদে করিয়া শয়ন, যতনে করেছেন ধারণ ॥ ধ্রুং ॥ সুসুম্না নাড়ীর অন্তর্গত, হৃদি সরোরুহে সঙ্গোপিত, নয়ন কমলে করি অর্চ্চিত, লয়েছেন্ ওপদে শরণ ॥ ১ ॥ অনন্ত অন্ত না পায় যার, শুনেছরে সুরাসুর ব্যবহার, তুমি তুচ্ছ নর বিশেষে পামর, অশেষ প্রকারে কঠিন ॥ ২ ॥ সতত বিষয় চিন্তাতুর, অতি দীন হীন রামচন্দ্র নর, ভাবিয়া উপায় নাহিক তার, ভরসা শ্রীনাথের বচন ॥ ৩ ॥

নিবিড় ঘন ঘন দামিনী দম্ভ, হরে তা রুচি ষোড়শী

রূপসী, কে দেখেছ মেয়ে এমন ॥ ধ্রুং ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা চিকুর জালে, মুখ পূর্ণ ইন্দু আধ ইন্দু ভালে, শ্রুতি যুগ মূলে, শব শিশু দোলে, নয়নে উদয় অরুণ ॥ ১ ॥

মন কি ভ্রান্তি তোমার। মনরে জেনেছ জানিছ, তথাপি ভাবিছ এমন কি সুখ আর ॥ ধ্রুং ॥ ধন জন পদ শূন্য হইলা, তথাপি বিষয় সুখ নাহি পাশরিলা, মুদিলে দুই আঁখি, সকলি যে ফাঁকি, তোমার কে তুমি বা কার ॥ ১ ॥ বেদের প্রমাণ তারে নামানিলা, শতসঙ্গে কত দেখিলা শুনিলা, যে বস্তু অনিত্য তারে মান নিত্য, জানিলা আমি আমার ॥ ২ ॥ আইলা বা কোথা যাইবিরে কোথা, রাম চন্দ্র তাহে না পাইলি ব্যথা, আজন্ম ভাবিলা কি লাভ করিলা, না ভাবিলা পদ তার। ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ ধিমা তেতালা তালেন গীয়তাং ॥

নাচে দিগম্বরী, শবাসনে, আসব পানে, তনু মাতা হুর ইল হেরি নয়নে ॥ * ॥ রুণু ঝনু সুমধুর, ঝঙ্কারিছে মধুকর, বাজিছে নূপুর তার, ও রাঙ্গা চরণে ॥ * ॥ সুখের নাহিক ওর, শিবাগণ ডাকেঘোর, গরবেতে ঢরঢর আনন্দ ভরে। দুলিছে কুণ্ডল ভার, ঢাকা শিব শবোপর, কে বুঝিবে ভাব

তার, সাধক বিনে ॥ ১ ॥ অর্দ্ধ শশী শোভে ভালে, শব শিশু শ্রুতিমূলে, বরাভয় করা অসি, করা করালে। নরশির মুক্তা মালা, বক্ষরুহ করে আলা, বদন চাঁদের মালা, মেঘ বরণে ॥ ২ ॥ ষোড়শী বয়সী রামা, ত্রিলোকের মনোরমা, ভুবনেশী গুণধামা, দক্ষিণা নামা। ওপদ পঙ্কজ রজ, ত্রিলোকের বৈভব, রামচন্দ্র অনুভব, এইসে মানে ॥ ৩ ॥

হেরি নবজলধর বরণী নয়নে, যে পদপঙ্কজ ভব তরঙ্গ তরণী ॥ ধ্রুং ॥ হৃদয় পঙ্কজ মাজে, দিগম্বরী হয়ে নাচে, সুমন্দ মধুর হাসে, মৃদুভাষিণী ॥ ❋ ॥ কুটিল কুন্তল জাল, শোভিত মুকুতামাল, নব অবদাঘ যেন, চুম্বে ধরণী ॥❋॥ কটিতটে নরকর, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধার, নবঘন মাজে যেন স্থির দামিনী ॥ ১ ॥ রবি শশী হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন, বদন পঙ্কজে যেন, ফিরে অলিনী ॥ ❋ ॥ গগণ ত্যজিয়া বিধু, সুধাধিক পিয়ে মধু, হয়ে দশ নখ বামার, নখর মণি ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র এই ভাষে, সদামমো অভিলাসে, দিবানিশি সুপ্রকাশে, জলদ বরণী ॥❋॥ হেরে যে জন শ্যামারূপ, সেই জানে কিতার সুখ, মনে কি হয় অন্যালাপ, এই সে মানি ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

শ্যামা গুণ ধামা অনুপমা, হেরি শিবের নয়ন ভুলিলো ॥

ধ্রুং ॥ অকলঙ্ক শশধর, ঢাকা যেন জলধর, সৌদামিনী অভিমানী, হয়ে লুকাইল ॥ ১ ॥ সুধা আশে চকোরিণী, পিপাসায় চাতকিনী, নীল নলিনী ভ্রমে, ভ্রমরী ভুলায় ॥ * ॥ মহা মেঘ ঘটা ভ্রমে, বক শ্রেণী উড়ে ব্যোমে, নাচে শিখী হয়ে সুখী ভূধর মানিল ॥ ২ ॥ চরণে নূপুর ধ্বনি, মরালের রব মানি, মরালিনী মত্ত হয়ে, যুথে২ ধায় ॥*॥ অনুভাবি পঞ্চশর, ডাকে পিক সুমধুর, মনসিজ পেয়ে লাজ, বসন্তে মাতিল ॥ ৩ ॥ ভুবনে উপমা হীন, কে বর্ণিবে শ্যামাগুণ, বেদের হয়েছে ভ্রম, শিবেরে ভূলায় ॥ * ॥ কহে রামচন্দ্র নরে, নবরস এক স্বরে, সুস্থির নহে অন্তরে, অসাধ্য হইল ॥ ৪ ॥

কি বামা মনোরমা শ্যামা। ভুবনেশী ভূবন ভুলাইলে ॥ ধ্রুং ॥ অখিল রসের নিধি, সকল সুখের অবধি, বৈদগধি গুণনিধি, গুণেতে বান্ধিলে ॥১॥ জননী হইয়া পালে, কুমারী হইয়া ছলে, কামিনী হইয়া কামে, সকলি ভুলায় ॥ * ॥ কার সে সুসাধ্য বটে, কে এড়াবে তার নিকটে, গুণ হীনা সে সগুণা, সকলি সকলে ॥ ২ ॥ দীন রামচন্দ্র ভাষে, শ্যামাপদ রজ আশে হয়েছে শঙ্কর যোগী, অভিলাসে যার ॥ * ॥ অনন্ত না পায় অন্ত, বেদ বিধি হৈল ভ্রান্ত, কিমপর সুরনর, পাবে কি ভাবিলে ॥ ২ ॥

হামির রাগেণ ॥ হরিতালেন গীয়তাং ॥

দেখরে শ্রীকৈলাস ধামাধীশ্বরী, শবাসনে মহাকালে কালী ॥ ধ্রুং ॥ মহাপীঠে ত্রিপঞ্চারে, রত্ন বেদীর অন্তরে, ভয়ানক গভীরে, ডাকে শৃগালী ॥ ❋ ॥ অঙ্ঘ্রিযুগ রক্তোৎপল নখরে বিধু মণ্ডল, সুধা আশে ভক্ত মন, হয়েছে চকোর ॥❋॥ শ্রীচরণে মণিময় নূপুর বাজে। যেন সুমধুর রব, করিছে মরালী ॥ ১ ॥ বামে অসি মুণ্ড করা, দক্ষে অভয় বরা, বদনে আসব ধারা, মুণ্ডমালী ॥ ❋ ॥ কাদম্বিনী সৌদামিনী, লাজে সুধাংশুর খনি, অদ্ভূত সুচিত্রিত, চন্দ্রার্দ্ধ কপালী ॥২॥ গলিত চিকুর ভারে, রাকা ঢাকা মেঘান্তরে, গরবেতে ঢরো ঢরো আনন্দ ভরে ॥ ❋ ॥ শিশু ভানু ত্রিনয়নে, শব শিশু কাণে, মনঃ ভূলাইলে শিবের রামের, নয়ন পুথলী ॥ ৩ ॥

ছায়ানট্ রাগিণ্যাং। উক্ত তালেন গীয়ন্তে।

শ্যামা মায়ের দরবার এবার প্রবেশ হওয়া ভার ॥ ধ্রুং ॥ দরবানি শিবা যার, কেবা শুনে কথা কার, দেওয়ান যেজন সেজন দিওয়ানার্ আকার ॥ ১ ॥ মহা শ্মশানেতে ঘর, তথা যাইতে লাগে ডর, নেঙ্গটা মেয়ে নেঙ্গটা সঙ্গী, বিষম ব্যব হার ॥ ❋ ॥ মাথায় জটা ঘন দাড়ি, ভূত প্রেত হুড়াহুড়ি, ছাই

মাথা মড়ার খুলি, মুখে সুধা ধার ।। ৩ ।। কাণে জবা এলো চুল, রক্ত আঁখি ঢুলু ঢুল, ববম্ ববম্ করে ভুল, অদ্বৈত আচার ।। * ।। কালীদাসের হৈতে দাস, রামচন্দ্রের অভিলাস, না ঘুচিল মনের ত্রাস, দুকূল আঁধার ।। ৫ ।।

উক্ত রাগেণ। জলদ তেতালা তালেন গীয়তে।

কালীকুলাও গো এবার। আমার মনের অনুসার।। ধ্রুং।। তব পদে রতি মতি, হয়েছে তার অসঙ্গতি, করিতে চাই সুসঙ্গতি, নামিলে উদ্ধার ।। * ।। দরিদ্র করিলে ঋণ, দিতে না পারে কখন, মিছাসে করে যতন, চেষ্টা মাত্র সার ।। ২ ।।দেখিয়া দারিদ্র দোষে, কেহনা সম্ভাষে দাসে, রামচন্দ্র এই ভাষে, জমা শূন্য যার ।। ৩ ।।

ঘুমে হইলি বিভোর, তোর ঘরে কাল চোর ।। ধ্রুং ।। এনিদ্রা স্বাধীন তোর, জাগিলে জাগিতে পার, ঘটাবে সে মহা নিদ্রা, নাহি হবে ভোর ।। ১ ।। চৌর সঙ্গে ঘুমাও ঘরে, নাহিক ভয় অন্তরে, করিলে চৌরেতে চুরি, কেকরিবে সোর ।। ২ ।। কি সাহসে করি ভর, উপায় নাহিক তার, রামচন্দ্রের ঘটান্তরে, থাকিল এ ঘোর ।। ৩ ।।

উক্ত রাগেণ ॥ হরিতালেন গীয়তে ॥

হবে আর কত দূর কালীপুর, শ্রীনাথ ঠাকুর ॥ ধ্রুং ॥ দিন মণি হল অস্ত, রাত্রিযোগে আছি ব্যস্ত, নিদ্রাভাবে কুণ্ডলিনী, অলস প্রচুর ॥ ১ ॥ চলিতে না পারি আমি, এদেহের দেহী তুমি, বামে রাখি মায়াপথ, দেখাও ব্রহ্মপুর ॥ ২ ॥ সম্বল হইল হীন, চঞ্চল চরিত্র মন, প্রপন্ন শ্রীরামচন্দ্র, সহজে অতুর ॥ ৩ ॥

কানোড়া রাগিণ্যাং ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

কালী হৃদয় মন্দিরে । আমার মানসে বিহরে ॥ ধ্রুং ॥ নাচিছে আনন্দ ভরে মহা কালউরে, চরণে নূপুর বাজে ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥ * ॥ কুঞ্চিত চমরী কেশে অর্দ্ধ শশী ভালে । অট্টহাসী মৃদুভাষী হরমনো হরে ॥ ১ ॥ নীল নলিনী ইব রজত শিখরে, আপন ইচ্ছায় দোলে আপনা সম্বরে ॥ * ॥ অনুপম শ্যামারূপ তনুমনো হরে, রামচন্দ্র অনাহতে দেখে সহস্রারে ॥ ৩ ॥

কালী সকলে সকলি ॥ ধ্রুং ॥ যে জন জানে সে কপালী । * ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা সেই চরাচর ভূতে, মায়াতে মাতিয়া

মাতি, আপনি হয় মাতালী ॥ ১ ॥ নিরাকারা সাকারা সে দ্বৈতাদ্বৈত রূপে, ভাবনা ভেদেতে শিব, রামকৃষ্ণ কালী ॥ ২ ॥ ভাবিলে নিকট ভাবে অভাবে বৈতালী, রামচন্দ্রের্ নয়ন্ পথে, কোথায়ে লুকালী ॥ ৩ ॥

উক্ত রাগেণ ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

আয়্‌রে ভাবিরে মনঃ স্বজনে বসিয়া ॥ ধ্রুং ॥ করিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমায় আমি জিজ্ঞাসিয়া ॥*॥ দশেন্দ্রিয় কর্ত্তা তুমি নব দ্বার পূরে, সকলি অধীন তোমার, আছি তব বাধ্য হইয়া ॥*॥ সুমেরু বাম দক্ষিণে ঈড়া আর পিঙ্গলা, অন্তরে সুসুম্না নাড়ী বজ্রিণী প্রবলা ॥ * ॥ চিত্রিণীতে গাঁথা পদ্ম ব্রহ্মনাড়ী মূলে, সুয়ে আছে কুণ্ডলিনী, তার মুখে মুখ দিয়া ॥ ১ ॥ মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর দিয়া, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য ক্রমেতে ভেদিয়া ॥ *॥ আজ্ঞা চক্র তবস্থান ছাড়ি মহাকাশে, হংস পীঠে নামে পদ, সেবিব আজ্ঞা লইয়া ॥ ২ ॥ হরে জন্ম মৃত্যু জরা যে ধাম পাইয়া, সগুণ নির্গুণ হয়্যো ত্রিতাপ নাশিয়া ॥ * ॥ রামচন্দ্র মনঃভাব ক্রিয়া শূন্য হইয়া, এইত যোগিরো যোগ, সঙ্গতি করিয়া ॥ ৩ ॥

বাগেশ্রী কানোড়া রাগেণ ।। উক্ত তালেন গীয়তাং ।।

সাধন কঠিন মনঃ দেখরে ভাবিয়া ।।ধ্রুং।। নাল ভয়ে কথার কথায় মায়াতে থাকিয়া ।। * ।। স্বগুণ স্বভাব জীব বর্ণাশ্রমে থাকিয়া। লক্ষিতে না পারে পথে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া ।। * ।। রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চ নিয়া। পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব ক্রমেতে ভেদিয়া। এইতো মায়িক দেহ ধারণ করিয়া। আছ যে বাসনা ময় কোষেতে বসিয়া ।। ১।। অনাদি অবিদ্যা গুণ বিচিত্র দেখিয়া। চিদানন্দ কনা জীব গেল সে ভূলিয়া। হয়ে পর তত্ত্ব সুখ আসে দুঃখ ভুঞ্জিয়া। জেন আম্র ফলে আশা পনশ রূপিয়া ।। ২ ।। যেমন কুলটা নারী কুলেতে থাকিয়া। পর পতি সেবে পতি বঞ্চনা করিয়া। বিষয়েতে পরমার্থ শ্রে রূপে ভাবিয়া। ধরিবা আকাশচন্দ্র রামচন্দ্র বামন্ হইয়া ।।৩।।

কানোড়া বাহার রাগেণ ।। খঁয়রা তালেন গীয়তে ।।

আরে মনঃ তারে ভাবনা নলনা, অন্তরে হৃদয় আলাকরি শ্যামা সুন্দরী শবোপরি দিক বসনা ।। ধ্রুং।। ধর্ম্মাধর্ম্ম পরি হরি কর ওপদে সতত বাসনা ।। * ।। মনতরী তবে ভবে যদি স্থির কর এই মন্ত্রণা ।। ১ ।। শুন২ যুক্তি পঞ্চ বিধা মুক্তি, শ্যামা পদে ভক্তি বঞ্চনা।। * ।। এই নিবেদন মনঃ যেন রামচন্দ্রে এবার ভূলাও না ।। ২ ।।

আরে মন্‌রে কি অঙ্গনা নগনা, সুন্দরী নীল নলিনী সঘনে দামিনী সুধাকর কর রঞ্জনা ॥ ধ্রুং ॥ তিমিরে তিমির, করিতেছে দূর, করে কর করে বঞ্চনা ॥ * ॥ মনোধিক তোমায় তুমি জ্ঞান নেত্রে, তারে দেখ না ॥ ১ ॥ নয়নের্ অঞ্জন, মনেরি রঞ্জন, শীতল হবে দেহ যন্ত্রণা ॥ * ॥ ভাবিয়া এইবার, রামচন্দ্রের ঘুচায়, ভব যাতনা ॥ ২ ॥

বাগে শ্রীকানোড়া রাগেণ ॥ মধ্যমান্ তালেন গীয়তে ॥

কররে সুসঙ্গে প্রসঙ্গ, কালীপদ লাভ কথা ॥ ধ্রু ॥ উদয় হবে ভকতি, ইষ্ট পদে দৃঢ় রতি, দূরে যাবে দুর্ম্মতি, যতন কর সর্ব্বথা ॥ * ॥ পরসে পরস মণি, লৌহ কাঞ্চন গণি, সত সঙ্গের এই ফল, হবে কি অন্যথা ॥ ১ ॥ বিষয় বাসনা যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে, রামচন্দ্র মুক্ত হবে, অনায়াসে যাবি তথা ॥ ২ ॥

মদন তরঙ্গে উলঙ্গে নাচে শিব সবে বামা ॥ ধ্রু ॥ চঞ্চলা সুস্থিরা গতি, মহা মেঘ প্রভাতথি, হরে সুধাকর দ্যুতি, ওরূপ মাধুরী সীমা ॥ * ॥ গলিত চিকুরে ঢাকা, ভালে অর্দ্ধ শশী রেখা, নয়ানে অম্বুজ সখা, উদয় ক্যরেছে। দশনে রসনা ধরা, অবতংশ শিশু মরা, বদনে সুধার ধারা, শব কর কাঞ্চী

দামা ॥ ১ ॥ সদ্য ছিন্ন শির ধরা, তীক্ষ্ণ অসি অভয় বরা, মুক্তা করা মুণ্ড হারা, আনন্দে দুলিছে॥ ❋॥ রক্ত জবা পদে লাজে, মণিময় নুপুর বাজে, নাম হৃদি সরো মীজে, বিরাজে দক্ষিণা নামা ॥ ২ ॥

রাগিনী কানোড়া ॥ তাল জলদ তেতালা ॥

অন্তরে অন্তর কালী নিরন্তর তারে দেখ, অন্তর্যাগে যাগী ভাবি পাবিরে পরম সুখ ॥ ধ্রুং ॥ বাক্য মনঃ অগোচরা বলে তারা শূন্যে থাক, সে কথা নাথের কথায় তুমিত মাথায় রাখ॥ ❋ ॥ মন্ত্রার্থ ধ্যান গোচরা মূর্ত্তিময়ী সে সাকারা, তারে বলে নিরাকারা, একি বিড়ম্বনা। জ্ঞান চক্ষু অন্ধ জার, বলে ব্রহ্ম নিরাকার, এইতো সিদ্ধান্ত তার, সেতো কালী, বহি মুখ॥ ১ ॥ তত্ত্ব মসি মহাবাক্য, ব্রহ্ম জীবে বলে ঐক্য, তাহে হয় পূর্ব্ব পক্ষ, উপাধি মায়ার॥ ❋ ॥ সোহং বলে মায়া দাস, না হতে উপাধি নাশ, লোকে করে উপহাস, লাজ নাই সে, দেখায় মুখ ॥ ২ ॥ যথা ব্রীহি তুসে বাস, নাহি নাসে অষ্ট শাশ, কভু ব্রহ্ম কভূ দাস, ম্লেচ্ছের আকার॥ ❋॥ মৃত্যুঞ্জয় যার দাস, সে কালী হইতে আস, একি কথা সর্ব্বনাস, কারে কব মনোদুঃখ ॥ ৩ ॥ সুসিদ্ধ সাধক সঙ্গ, পরমার্থ রস রঙ্গ, করি কর সুপ্রসঙ্গ, সন্দেহ নিরাস ॥ ❋ ॥ অবিদ্যা সুবিদ্যা

হবে, কে তুমি জানিতে পাবে, রামচন্দ্র হবি তবে, কালী পদে উন্‌মুখ ॥ ৪ ॥

শিব আরাধিতা কালী পদ কর আশা ॥ধ্রুং॥ আজন্ম মায়ার ঘরে যতনে করিছ বাসা ॥ * ॥ অনাদি কুকর্ম্ম যোগ, জন্মিল তোর ভব রোগ, পাপ পুণ্য করি ভোগ, অখণ্ড হয়েছে দশা ॥ ১ ॥ জ্ঞান শূন্য ব্রহ্মজ্ঞানী, ধ্যান শূন্য তথা ধ্যানী, অলসে না হলি কর্ম্মী, নিষ্কর্ম্মীর প্রায় ॥ * ॥ নাহিক ভক্তির লেস, মুক্তি পথে সদা দ্বেষ, তুমিত পাপীর শেষ, হলি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশা ॥ ২ ॥ সত সঙ্গে নাহি রাগ, অসৎ সঙ্গে অনুরাগ, অসত্যে হয় সত্য ভাব, সত্যে নাস্তিকতা ॥*॥ এই অনুমান কর, নাহি হবে জন্মান্তর, নর হয়ে হলি খর, রামচন্দ্রের এই ভাষা ॥ ২ ॥

বেহাগ রাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

ঘন২ ঘটা ছটা স্থির দামিনী, কামিনী কামান্তে উরে ॥ ধ্রুং ॥ হেরি নখচন্দ্র শোভা, লজ্জিত চন্দ্রের প্রভা, লুকাইল অরুণ আভা, পাদপদ্ম তলে ডরে ॥ * ॥ নীলকমল বলি, মকরন্দ আশে অলি, ঝঙ্কারে করিছে কেলি, পদতলে তার। রজত শিখর পরে, মহামেঘ প্রভা হরে, হেরিলে চাতক উড়ে, নাচে ময়ূরি ময়ূরে ॥ ১ ॥ মুক্তকেশী কেশে ঢাকা, মুখ

অকলঙ্ক রাকা, বিচিত্র কি চন্দ্ররেখা, কপালে তাহার ॥ * ॥ উদয় মিহিরা রুণ, সুপ্রকাশ ত্রিনয়ণ, নাশায় মণি রতন, বেশরে চপলা ঝরে ॥ ২ ॥ করবাল মুণ্ডকরা, সব্য দক্ষে অভয় বরা, কর্ণে শোভে শিশু মরা, শিরোহার উরে ॥ * ॥ করের মেখলা পরী, দন্তাগ্রে রসনা ধরি, অনুপমাকেসুন্দরী হাসিতে,অমিয়া ক্ষরে ॥ ৩ ॥ মহা শ্মশানে বিহরে, মহাযন্ত্রে ত্রিপঞ্চারে, দিগম্বরী দিগম্বরে, আনন্দে বিহরে ॥*॥ শিবারব ঘন ঘোর, সুখের নাহিক ওর, রামচন্দ্র তনুতোর, দক্ষিণায় দক্ষিণাদেরে ॥ ৪ ॥

রতিরস রঙ্গিনী হর হৃদয়ে, বিহরে হৃদয়াম্বুজে ॥ ধ্রুং ॥ জলদে তড়িত মাখা, তাহে মিসাইয়া রাকা, তেজোময়ী তেজে ঢাকা, আপন সুখে সে বিরাজে ॥ * ॥ বাক্য মনের নাহি গতি, অব্যক্তা অচিন্ত শক্তি, গার যেমন বুদ্ধি গতি, ভাবে তেমনী ॥ * ॥ মন্ত্র অর্থ ধ্যানাভাষে, চিদানন্দ ময় কোষে, জ্ঞান নেত্রে সুপ্রকাশে, ধন্য নরে তারে ভজে ॥ ১ ॥ ভাবনায় ভাবনা হরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, মনোনেত্রে নাহি ফেরে, রূপ হেরি তার ॥ * ॥ দেখি শ্যামাপদ দ্বন্দ, উদয় পরমানন্দ, শূন্য হয় কামগন্ধ, কহে রামচন্দ্র দ্বিজে ॥ ২ ॥

কুরু কুরুণা ময়ী কিঙ্করে করুণাবলোকন ॥ ধ্রুং ॥ হয়ে

আশুতোষ দয়ারা, ধরেছ বাপের ধারা, একি বিপরীত তারা, লুকাইলা, করুণা ধন ॥ ❋ ॥ রামচন্দ্র অকিঞ্চন, সাধন স্মরণ হীন, কিরূপে পাইবে ত্রাণ, নাহিক উপায় ॥ ❋ ॥ অক্ষম হই য়াছি ভবে, গতি হীনের কি হইবে, বঞ্চনা করিলে শিবে, দাড়াইতে নাহি স্থান ॥ ১ ॥

বেহাগ রাগিণ্যাং ॥ হরিতালেন গীয়তে ॥

ঘরে কালী তোর, হের মহাকালে বসিয়া ॥ ধ্রুং ॥ তীর্থা টন উচ্চাটন মনো ধৈর্য্য ধরিয়া, হর মৃগ তৃষ্ণা শতসঙ্গে আগে করিয়া ॥ ❋ ॥ অহঙ্কার কন্যা মায়া, তনয়া প্রবৃত্তি জায়া, ঘরে আছে তোর, সন্তান লইয়া ॥ ❋ ॥ পুণ্য পাপ নাম, তার, মায়ে ছায়ে দূর কর, যষ্টি কালী নাম করে, করি দেও তাড়িয়া ॥ ১॥ ধন্যাচিৎ শক্তি তনয়া, নিবৃত্তি নামেতে জায়া, জ্ঞান বিজ্ঞান তনয়, কোলে করিয়া ॥ ❋ ॥ আনিয়া ভাবের ঘরে, রামচন্দ্র যত্ন ক্যরে, সোদর বিবেক তার, সঙ্গের সঙ্গী হইয়া ॥ ২ ॥

সকল অবসর হওরে তনু মনঃ সঁপিয়া ॥ ধ্রুং ॥ যাবেরে যখন প্রাণ তনু গড় ভাঙ্গিয়া। দিবেরে তখনি মন্ত্রণা তব ভুলিয়া ॥ ❋ ॥ হবি যখন ঘটান্তর, সেকালে বিপদ ঘোর, স্বাভাবিক আপন, ভাব ডুবিয়া ॥ ❋ ॥ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল,

উদয় হবে সকল, ভাবিবি কি কালী, কাল ভয়ে ভয় পাইয়া ॥ ১॥ রামচন্দ্র জ্ঞান হীন, কেমনে সে দীনের দীন, মুক্ত হবে একারণ, দেহে থাকিয়া ॥ ❋॥ অতএব বলি মনঃ এশরীরে সে সাধন, কালী কালী বলিও, কালীর পদ ভাবিয়া ॥ ২ ॥

আনন্দময়ী নিরানন্দ দূর করো গো ॥ ধ্রু ॥ চিদানন্দ ময় কর, সকল সংশয় হর, অন্তর বাহিরে অভেদ, রূপ হও গো ॥ ❋ ॥ মূলাধার সহস্রার ভাবে এক ঘর কর, জ্ঞানেরে বিজ্ঞান ধামে লইয়া ॥ ❋ ॥ ষটচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের ক্ষেদ, মিলাও হংস হংসী, দশ শত দলে রও গো ॥ ১ ॥ তত্বমসি মহা বাক্য, তার ফলে হও ঐক্য, শক্যার্থে লক্ষণা দূরে করিয়া ॥❋॥ সত্য আর বিজ্ঞান আনন্দ, ঘুচাও গো তাহার দ্বন্দ, রামচন্দ্র নাম এই, উপাধী তার হর গো ॥ ২॥

ভৈরব রাগেন ॥ একতালা তালেন গায়তে ॥

মনো মতের সমাজে আমি শুনেছি সিদ্ধান্ত কথা ॥ ধ্রু ॥ অভাবের স্বভাব, না হয় নিত্য ভাব, ভাবের ভাব, সেকি হয় অন্যথা ॥ ❋ ॥ হইলে সুবিদ্যা, জানে মহাবিদ্যা, নতুবা অবিদ্যায়,প্রমাদ ঘটে ॥ ❋ ॥ অস্তি নাস্তি জ্ঞানে, শূন্য তত্বজ্ঞানে,

যারে তারে ব্রহ্ম মানে সর্ব্বথা ॥ ১ ॥ আগম নিগম, না হয় সুগম, দুর্গম তাহারি বিচার কথা ॥ * ॥ নাহি অধ্যয়ন ব্রহ্ম নিরূপণ, করিতে চায়, খেয়ে লাজের মাথা ॥ ২ ॥ যে মানে অদ্বৈত, সে নহে অদ্বৈত, না হয় সঙ্গত, তাহারি কথা ॥ * ॥ সগুণ নির্গুণ, না হয় কথন, রামচন্দ্র মনঃগত এই ব্যথা ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড শ্রীভবানী বিষয়ক
গীতাবলী সমাপ্তাঃ ॥

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণস্য রাসলীলা বর্ণনা পদাবলী॥

হাম্বির রাগিণ্যাং। খয়রা তালেন গীয়তাং॥

মাইরি গৌরচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র উদয় ভকত কে সমাজ, রাজত সব লাজত, অবকোটি মদন॥ ধ্রুং॥ করুণা কিরণ করি বিথার। নাশত হৃদি অন্ধকার। বরিখত হরনামামৃত, তাপ ত্রয় ভব খণ্ডিত। গত অদ্ভুত রাকাপত পতিত চরণ॥ ১॥ প্রেম ভকতি নির্ম্মল যশঃ। বিস্তারিত কিয়ে দশ দিশ। শীতল গুণে জগদানন্দ, তাপিত রহে রামচন্দ্র, পতিতনকে রাজা সোই লোচন হীন॥ ২॥

উত্কণ্ঠিতা॥

মাইরি শরদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ, পূরণ মণ্ডরি ভেয়ী শোভা, সুখ সিন্ধু সিন্ধু তনয়া মুখ॥ ধ্রুং॥ নব কুঙ্কুমারুণ সুন্দর, অতি নিরমল সুশীতল কর, বিরহিনীগণ নয়ন পাপ, অন্তর বহু দেতাপ, দেখ উড়ুপত, অদ্ভুত গত, রজনী মুখ॥ ১॥ বৃন্দাবন বনকে শোভা, রমণী কুল মনকী লোভা, বংশীবট

পুলিন মাজ, ভেয়ীরী আজু সুখ সমাজ, পায়ে লাজ মদন রাজ, আজুকে সুখ ॥ ২ ॥ প্রফুল্ল মল্লিকা কুসুম দাম, পেখি মুরলী পুরত শ্যাম, অনুকুল ভেয়ী যোগ মায়া, নিকসতী সব গোপ জায়া, ধাই বৃন্দা বিপিনে, রামচন্দ্রকে মনঃ। ৩ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ তেওট তালেন গীয়তে ॥

আলিরে, শ্রীনন্দনন্দন আজু পুলিনে বাজাওত বংশী। ধ্রুং॥ মোহন মূরত শ্যাম, সুগত সুন্দর ঠাম, সুললিত অনূপম, মনঃ মোহেরি,রতিপত মুরছত, ভুবন কি যোষিত, ভুলি গেয়ী নিজপত, বননিকসী । ১ ॥ তন মনঃ আন ছান, বিনাদর শন কান, ব্যাকুল ভেয়ীরি প্রাণ, না রহে মেরি ॥ * ॥ লে চলো যাঁহা শ্যাম, সকল পূরণ কাম, উৎকণ্ঠিত কবিরাম, কাহে বসি ॥ ২ ॥

ইমন্ রাগিণ্যাং ! খয়রা তালেন গীয়তে।

পুলিন বনে আজু বাজেরে, ছন ছন ঘন নাদ মুরলী শ্যাম সুন্দরকি ॥ ধ্রুং ॥ ব্রহ্মানন্দ সুখকে দূর, প্রেমানন্দ সুখ প্রচুর মনঃ হি শ্রবণানন্দপুর, বনিতা কুলকি ॥ ১ ॥ বংশী বট সন্নি

ধান, করধৃত বেণু গোপী প্রাণ, মহারাসারম্ভী কান, বিপদ মদনকী ॥ ২ ॥ কহত হিঁ কবিরামচন্দ্র, পুলকিত তনু প্রেমানন্দ, চলতাঁহি সখী গোপী বৃন্দ, ব্রজমণ্ডরকি ॥ ৩ ॥

শুনরি সখি বন বাজেরি, গত অদ্ভুত নন্দকে সুত কয়সেঁ বজানে হার ॥ ধ্রুং ॥ বংশীকে ধুনী মদন কদন, ছাইরি সুর পুরহি গগণ, ব্রহ্ম কটাহ করত ভেদ, রাজত অনিবার ॥ ১ ॥ গরজত ঘন মন্দ মধুর, স্তম্ভিত জল বহ্নি সমীর, পুলকিত খগনগদ্রুম পশু, বরিখে অমিয়াবার ॥ ২ ॥ বেণুনাদ শ্রবণামৃত, উদ্দীপন নন্দকে সুত, পুলক প্রেম ভাবাদ্ভুত, বহত নয়ন বার ॥ ৩ ॥ চরণে স্মরণ রামচন্দ্র, রাসারম্ভী শ্রীগোবিন্দ, যমুনা পুলিনে গোপী বৃন্দ, আই ভুবন নার ॥ ৪ ॥

ছায়ানট্‌রাগেণ । হরিতালেন গীয়তে ॥

বনে বাজে অতি দূর, বেণু সুমন্দ মধুর ॥ ধ্রুং ॥ ত্রিভুবন মোহে রবে, কোন্ নারী ঘরে রবে, ভুলে পতি সতীর খসে কটির মেদূর ॥ ১ ॥ আন্‌ছান্ করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মনঃ মুগ্ধা গোপ বধূর ইকি, কলঙ্ক অঙ্কুর ॥ ২ ॥ কবিরাম চন্দ্র ভাষ, উৎকণ্ঠিতা এই রস, না পুরিবে মনের আশ, বিঘ্নের প্রচুর ॥ ৩ ॥

তন মনঃ ধন প্রাণ মেরি, হরলিয়ে কান ।। ধ্রুং ।। ভবন তায়েঁ কাহেঁ, দিন পুলিন মে রহেঁ, নয়ন নয়ন চাহে, বয়ানে বয়ান ।। ১ ।। গেঁয়ে গুরু জন ভর, অভয় ভেয়ে অন্তর, উমড গুমড জিয়া, করেঁ আন্ ছান্ ।। ২ ।। উৎকণ্ঠিতা ইয়াকো নান কহত শ্রীকবিরাম, বংশী বজায় শ্যাম, সুমধুর তান ।। ৩ ।।

কানোড়া রাগিণ্যাং ।। আড়া তালেন গীয়তে ।।

চলোরি চলোরি সখি আজু শুভ হন মানি, আহরি ভূবনাঙ্গনা, শুনি মুররিকে ধুনি ।। ধ্রুং ।। মধুর মুররীরব, পরাভব মনঃভব, কাহে তুড়রতী অব, কুলকে গৌরব মানি ।। * ।। রন্ধন ভোজন কোই ছোড়ি লোচনাঞ্জন। ছোড়ি কোই অঙ্গ রাগ অঙ্গকে উদ্বর্ত্তন ।। * ।। গোরস সুরস শিশু মুখ পর ছোড়ি, ছোড়ি পতিকে সেবা, বেদ মারগ রোধিনী ।। ১ ।। বসন ভুষণ সবী উলট পলট ভেয়ী। বিসর গেই বিসব সুরত না আই ।। * ।। প্রাণ মনঃ জ্ঞান তিন হরলিয়ে, মুররী কাহুকে না কহেঁ কোই, যোগ মায়াকে বঞ্চিনী ।। ২ ।। কহে কবিরামচন্দ্র করি অনুমানে, সাধন সিদ্ধাকে রিত এহিমত পুরাণে ।। * ।। মহারাস করতহি নিত্য সিদ্ধাকে নিয়ে, জুগত সেঁা কহিঁ মহারাজা, সেঁা শ্রীশুকমণি ।। ৩ ।।

ছায়ানট রাগিণ্যাং ॥ হরিতালেন গীয়তে ॥

উৎকণ্ঠিতা রাস বিলাপ।

কুলে কলঙ্ক করিল, শ্যামের মুররী ॥ ধ্রু ॥ ভাগ্যহীনা গোপী তারে, পুলিনে আনিতে নারে, বন্ধু বর্গে রাখে তারে জন করি ॥ ১ ॥ দুঃসহ কৃষ্ণ বিরহ, অশুভ নাগিল সেহ, ধ্যানে পুণ্য ময় দেহ, হরিল তারি ॥ ২ ॥ পাপ পুণ্য নাশে তারি, গুণময় দেহ ছাড়ি, যোগী যেন যোগ করি, পাইল হরি ॥ ৩॥ রামচন্দ্র অনুগত, যার বুদ্ধে কৃষ্ণ প্রাপ্ত, প্রমাণ শ্রীভাগবত, রয়েছে তারি ॥ ৪ ॥

রাগিণী কানড়ার মাজ ॥ তাল খয়রা ॥

শুন সই ঐ বাজে পুলিনে মুররি, শ্যামেরো এখন কি করি, রইতে যে নারি, চলহে চলিলাম বিপিনে ॥ ধ্রুং ॥ পূর্ণ ইন্দু কুমদ বন্ধু উদয় হয়েছে গগণে ॥ * ॥ শ্রীবৃন্দাবনে আজু হইয়াছে কি শোভা কিরণে ॥ ১ ॥ সরদে প্রফুল্ল মল্লিকা কুসুমে গন্ধামোদিতা রজনি ॥ * ॥ মলয়াচল দিলো মন্দ মধুর পবনে ॥ ২ ॥ শুনি২ বংশীরোধ্বনী রমণীর রতি পতি জাগিল ॥ * ॥ কৃষ্ণ গৃহীত মনাচলে ভূলিয়া আপনার

স্বগণে ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র যার কর্ম্ম মন্দ রহিল মায়ার ভবনে ॥ * ॥ কি হবে গতি যেজন বঞ্চিত হইল শ্রবণে । ৪ ॥

পরজ রাগেণ ॥ আড়া তালেন গায়তে ॥

আজু কেন ঘন বেণু বাজে নিশিতে, আকর্ষণ করে প্রাণ নারি রহিতে ॥ ধ্রুং ॥ জল বায়ু বহ্নি স্তম্ভ, পাষাণ হইল অম্ভ, খগ মৃগ পুলকাঙ্গ, বেণূ নাদেতে ॥ ১ ॥ হৃদয়ে প্রবেশ করে, ব্রহ্মানন্দ সুখ হরে, প্রেমানঙ্গ সুখোদয়, করে বেণু তে ॥ ২ ॥ পতিব্রতার ব্রতভঙ্গ, বাড়িল মদন রঙ্গ, কহে কবি রামচন্দ্র, হৈল যাইতে ॥ ৩ ॥

বসন্তরাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

হরিরূপ অপরূপ চল দেখিতে, নিরমিল বিধি তারে বৈশে নিভৃতে ॥ ধ্রুং ॥ যে দেখেছে একবার, মনোনেত্র নহে তার, সেকি গো কখন ঘরে, পারে থাকীতে ॥ ১ ॥ ভুবন মোহন চান্দ, পাতিয়া রূপের ফান্দ, ধরিকুল বধু ধরে, নয়ান বানেতে ॥ ২ ॥ লৈয়া রামচন্দ্র সঙ্গে, বৃন্দাবন চলরঙ্গে, কালাতো ঘুচাইবে জ্বালা. কি কায গৃহেতে ॥ ৩ ॥

কামোড়াবাহার রাগিণ্যাং ॥ খয়রা অলেন গীয়তে ॥

অভিসার ॥

চলে সই রাই কানু শকাশে। বিনাশে পুলিনে মহা রাসেশ্বরী, সঙ্গে সহচরী রূপে কোটি শশী প্রকাশে ॥ ধ্রুং ॥ স্থল পদ্ম জয়ী পাদপদ্ম শুধা কর কর নখরে। মণি মঞ্জির তায়, যেন কুহরে হংস সারসে ॥ ১ ॥ পূর্ণ ইন্দু বদন মণ্ডল ঘন ঘটাবৃত ছুকুলে। উরহারা বলি যেন চপলা প্রকাশে আকাশে ॥ ২ ॥ শ্রীঅঙ্গ রাগগন্ধা মোদিত মধু আশে পাশে ভ্রমরি, রামচন্দ্র মনো পাদ পদ্মাসব, পান রত সে ॥ ৩ ॥

রাগিণী ছায়ানট্ ॥ তাল ধিমা তেতালা ॥

নবরঙ্গী কিশোরি চলিলো ভেটীতে মুরারি ॥ ধ্রুং ॥ প্রেম মদে ঢর ঢর, ভূলি গুরুজন ডর, শ্যাম সোহাগিনী শ্যামের গরব করি ॥ ১ ॥ সখি অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, আবেশে অবশ হৈয়া, চলিতে না পারে সেতো রাজ কুমারী ॥ ২ ॥ কবি রাম চন্দ্রের আশ, ওপদে হইতে দাস, অভিসার এই রসে, মিলিবে হরি ॥ ৩ ॥

বেহাগ রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

চলে রাস মণ্ডলে শরদ রজনী সৈ রমণী ভুলাইলে ॥ ধ্রুং ॥
হংশশ্রেণী মুগ্ধাবালা, বেড্র্যাইল চান্দের মালা, ঢাকিয়া
চান্দের আলা, উদয় ভূতলে ॥ ❋ ॥ বসন ভূষণ শোভা,
শ্রীকৃষ্ণের মনোলোভা, স্থকিত চপলা প্রভা, গজগামিনী ॥❋॥
গুরু জনার নাহি ডর, প্রেম মদে চরোচর, কবিরামচন্দ্র নর,
চল চলিলে ॥ ১ ॥

চলে পুলিন বনে। মুরলি ধ্বনি সুনি ধনি শ্রবণে ॥ ধ্রু ॥
সচকিতা বেণু পথে, চলে সবে যুথে২, ব্যস্ত পরাব্যতিক্রমা
বস্ত্র ভূষণে ॥ ❋ ॥ রন্ধন ভোজন ত্যাগি, কৃষ্ণমনা অনুরাগী,
নাহি ডাকে কেহকারে, আয়গো সখি আয় ॥ ❋ ॥ বেণুরো
বিচিত্র রঙ্গ, পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ, কহেকবি রামচন্দ্র, শ্রীবৃন্দা
বনে ॥ ১ ॥

পরজ মালকোশ রাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তে ॥

অভিসার গোপিনী আগমন ॥

গোপিগণের আগমন ॥ হইল যথা শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ধ্রুং ॥
পুলিনে চপলা মালা, উদয় গোপের বালা, ঘন ঘটা শ্যাম

কালা, ভুবন মোহন ॥ * ॥ মুগ্ধা মধ্যা গোপী গণে, বেণু নাদ উদ্দীপনে, আইল পুলিন বনে, কান্ত সন্নি ধান ॥ * ॥ শ্রুতি কন্যা মুনিকন্যা, ভুবনেতে মান্যা ধন্যা, আর এলো দেবকন্যা, একত্র মিলন ॥ ১ ॥ যুথে যুথে যুথেশ্বরী, অঙ্গ ভূষা হেরি হেরি, আপন আপন সহচরী, নিন্দে পরস্পর ॥ কৌতুকে কৌতুক বৃদ্ধি, পাইয়া পরম নিধি, হৈল নিজ কার্য্য সিদ্ধি, করি দরশন ॥ ২ ॥ কবিরামচন্দ্র কয়, নাহিগুরু জন ভয়, লোক লজ্জা নাহি রয়, প্রেমের লক্ষণ ॥ * ॥ কৃষ্ণ কৃপা করে যারে, সে কি ত্রিভুবনে ডরে, ঘরে হৈতে বাহির করে, ক্যরে আকর্ষণ ॥ ৩ ॥

উৎকণ্ঠিতায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি ॥

বেণু করি আকর্ষণ, আনিলো যত কুল বধুগণ ॥ ধ্রুং ॥ আর এক অসম্ভব, করিয়া বেণুর রব, নরনারী করে শব, মোহে ত্রিভুবন ॥ * ॥ বিচিত্র বেণুর গানে, আকর্ষিয়া গোপি প্রাণে আনে নিজ সন্নিধানে, রাসমণ্ডলে ॥ * ॥ পতি পিতা ভ্রাতা তারে, যতনে রাখিতে নারে, নির্ভয় হয়ে অন্তরে, করে আগমন ॥ ১ ॥ গোকুলের অনেক নারি, পিতা ভ্রাতা পতি ভারি, রাখে দ্বার বন্ধ করি, নির্গম না হয় ॥ * ॥ ধ্যানে কৃষ্ণ চিন্তা করি, গুণময় দেহ হরি, পাপ পুণ্য পরিহরি, পায় দর

শন ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র এই কয়, ভক্তিতে ভাবেরুদয়, তবে সে অন্তরে হয়, প্রেমের উদয় ॥ * ॥ দূরে যায় ভক্তি মুক্তি, তবে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তি, নহিলে কাহার শক্তি, দেখে শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

বেহাগ রাগেণ ॥ উক্ত তালেন গীয়তাং ॥

রাশরসেরসাভাসে নন্দনন্দন, জিজ্ঞাসেন গোপীকাগণে ॥ ধ্রুং ॥ কহ২ সুমঙ্গল, ব্রজের মঙ্গল বল, আইলা যমুনা কূল, পুলিনে কার অন্বেষনে ॥ * ॥ ঘোর রূপা এ রজনী, ঘোর সত্ব নিষেবিনী, তোমরা কুল রমণী, পুনঃব্রজে যাও ॥ * ॥ পিতা মাতা ভ্রাতা পতি, ব্যাকুল হইয়া অতি, নানা স্থানে করে গতি, পরিশ্রান্ত অদর্শনে ॥ ১ ॥ শুনহে বেদের মর্ম্ম, পতিব্রতার এই ধর্ম্ম, পতি সেবা বিনা কর্ম্ম, নাহি আর তার ॥ * ॥ পতি বন্ধুবর্গ যত, হবে তারি অনুগত, এইতো সতীর রীত, বৈদিকে লৌকিকে মানে ॥ ২ ॥ নারী উপপতি করে, সদা ভয় তার অন্তরে, গুণে দোষ মানি করে, কলঙ্ক তাহার ॥ * ॥ সর্ব্বত্র অযশ গায়, মৈলে স্বর্গ নাহি পায়, জীবনে মরণ প্রায়, অখ্যাতি রহে ভুবনে ॥ ৩ ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, গোপীকার অন্তরে ব্যথা, লাজে করি হেট মাথা, কান্দে অনিবার ॥ * ॥ পদনখে ক্ষিতি লিখি, রামচন্দ্র হৈল দুঃখি, কর না উত্তর সখী, এখন কি ভয় মনে ॥ ৪ ॥

রাসে গোপ্যুক্তি।

বিনয়ে গোপীকা কহে প্রাণনাথ,কেন করহে বঞ্চনা ।।ধ্রুং।। পুরিয়া বেণুর গানে, সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণে, আনিয়া পুলিন বনে, উচিৎ কি বিড়ম্বনা । * ।। বন্ধুবর্গ পরিত্যাগি, তবপদে অনুরাগি, হয়ে হইলাম দুঃখভাগী, করুণা তোমার ।। * ।। নাথ যদি উপেক্ষিলে, নাহি আর যাব গোকুলে,প্রবেশি যমুনা জলে, অগ্নিকুণ্ডে ত্যক্তপ্রাণা ।। * ।। তুমি নাথ বেদ বক্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মের তুমি শাস্তা, নাহি তোমার কথার আস্তা, একি অবিচার ।।*।। পাদপদ্ম নিকট হৈতে, নাপারি ব্রজে যাইতে, অবলা শরলা তাতে, নাহি কর বিবেচনা ।। ২ ।। তুমিতো প্রাণের পতি, তোমাবিনা নাহি গতি, ইথে কি অবলা রক্ষতি, কলঙ্ক তোমার ।। * ।। শুনিয়া গোপীর উক্তি, প্রসন্ন গোপীর পতি, রামচন্দ্র মাগে ভক্তি. গোপিপদ বাসনা ।। ৩ ।।

জয়জয়ন্তী সুরট্ রাগিন্যাং ।। ঝাঁপতালেন গীয়তাং ।।

রাস রস বর্ণনা ।।

সখিহে যমুনা তটে বংশীবট সন্নিকটে । পুলিনে শ্রীরাধা সহ বিহরে রাসে হরি ।। ধ্রুং ।। রচিত মনি মণ্ডপে, শোভে চন্দ্রাতপে, ক্ষচিত মণি কাঞ্চনে, রতন বেদি কোপরি ।। * ।।

উদিত সুধাংশু করে, বৃন্দাবন শোভা করে, বিকচে কুসুমা বলি, গন্ধামোদিত করে ।। ❋ ।। স্বর্ণময় বৃন্দাবন, যমুনা জল নীলঘণ, কুমুদ কূল পরিমলে, ঝঙ্কারিছে মধুকরী ।। ১ ।। শ্রীঅঙ্গরাগ রুচি জলদ মহিমা হরে। হরিল হরিতাল ছবি পীত পট কটিপরে। বদন সুধাংশু পরিপূর্ণ মণ্ডল হরে। অরুণ নয়নাম্বুজে, মনসিজে মোহে নারী ।। ২ ।। মণি মুকুট বিজয়ী শিখি পিচ্ছ চূড়া শিরে। ভালে অলকাবলি বংশী মধুরা ধরে। শ্রবণে মণি কুণ্ডলে কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি। হার বনমালা গলে, নাচে ত্রিভঙ্গ করি ।। ৩ ।। রক্ত জবা নিন্দি নবরাগ চরণাম্বুজে। লাজে নখরে শশী রত্ন নূপুর বাজে, কন্দর্প দর্প হরে হেরি রূপ মাধুরী, শ্রীরামচন্দ্র কবি রাধা পদে কিঙ্করী ।। ৪ ।।

আজু বৃন্দাবনে যমুনা পুলিন বনে নন্দকে নন্দন মদন মোহে সখি ।। ধ্রুং ।। রাসে রাসেশ্বরী তাকিজো সহচরী। তাকিজো অঙ্গজা মিলিত মঞ্জরী ভেয়ী ।। ❋ ।। গোপনকে কামিনী হৈমকান্তি মণি। ঘেরি চৌতুর সখি স্থকিত সৌদামিনী। রতন আভরণ তন হার উররাজতী রেসমকে সাড়ি, সুচিত্র চুনারি ওঢ়ি ।। ১ ।। মরকত মণি নিকর শ্যামসুন্দর বর, মিথুনকে প্রথমজীমুত নবকান্তি ধর। তামো পীতাম্বর তড়িত কে জ্যোতি হর। রূপকে ভূপ গোপিনকে শোভা হরে ।। ২ ।।

সোহে বনমাল উরহার গুঞ্জাকেরি। কুসম আভরণ তনকণ্ঠে কৌস্তুভ ধরি। অঙ্গ ত্রিভঙ্গ সুবঙ্কিম লোচন। শিরসি চূড়া শিখি পিচ্ছ সোহে চন্দ্রিমা। ৩॥ উদয় রাকারুণ ছায়ে বৃন্দা বন। কানকে মুররি ঘন বোলহিঁ ছনছন। গণিত পাথালদ্রুম মোহে পশু পক্ষিগণ। চলিত তুকূলকূল ভুবনকে নারীগণ॥৪॥ ভয়েরি মুরতী মতি রাগ সহ রাগিনী, বাজে বহু যন্ত্র যাঁহা গোপিনী যন্ত্রিণী। নাদগত ভেদ সুরব্রহ্ম পুর ছায়েরী। প্রণত কবিরাম হৃদি বাজে রাসেশ্বরী॥ ৫॥

উক্ত রাগিণ্যাং॥ কওয়ালি তালেন গীয়তে॥

সখি সুখমে পরম সুখ ধাম। অখিল রসামৃত মূরতি যুবতী নয়ন মনকি অভিরাম॥ ধ্রুং॥ নবীন কৈশর, নটবর সুন্দর, কমনীয় বদন শ্যাম। রতিপতি মোহন, বল্লবী জীবন, নন্দকে নন্দন নাম॥ ১॥ ব্রহ্মা নন্দ সুখ, বৈমুখ, অনুভব, প্রেমানন্দ পরিনাম। রামচন্দ্র তনু মন রঞ্জন, রূপ পদপঙ্কজ রজ কাম॥ ২॥

বেহাগ রাগিণ্যাং॥ খয়রা তালেন গীয়তে॥

নর্ত্তক রাস।

রাসমণ্ডলে সই নাচে নব নাগর ঐ নাগরী॥ ধ্রুং॥ মণি

নির্ম্মিত স্তম্ভ বিদ্রুম, জবা কুশুমাবলি বিভ্রম, চন্দ্রাতপ চন্দ্র মণ্ডল, মুক্তা সারি সারি ॥ * ॥ মরকত মণি চিত্রিতাঙ্গ, বঙ্কিম ভ্রু ত্রিভঙ্গি ভঙ্গ, বঙ্কিম লোচন পঙ্কজ, বঙ্কিম চূড়া ধারী ॥ * ॥ বঙ্কিম করে বংশী বদনে, বাজিছে রতন নূপুর চরণে, উরসি হার পীতাম্বর, গোপীকা মনোহারি ॥ ১ ॥ পুটিত হেমকান্তি গৌরী, ত্রিভুবনে একা ঐ সে সুন্দরী। নীলাম্বরী মরি কি মাধুরি, উপমা নাহি তাহারি ॥ * ॥ চরণ কমলে কমল লাজে, পদতলে জবা কুসুম রাজে। বাজে নূপুর মধুর মধুর, শ্রবণে মোহে মুরারি ॥ ২ ॥ নাচে চারি দিগে মুগ্ধা রমণী, করে কঙ্কন কটি কিঙ্কিণী, বাজিছে চরণে নূপুর ধ্বনি, শ্রবণে মধুর মাধুরী ॥ * ॥ করতালি করে বাজে, মুতুঙ্গ দৃমিকি দৃমিকি বাজে, মৃদঙ্গ কঙ্কণ কর জয় শ্রীরাধে, ঘনঘন বাজে মুররি ॥ ৩ ॥ রাস মণ্ডলে সুপ্রকাশ, রমণী গণের পুরিল আশ, গোপীদ্বয় মধ্যে বাস, রাসোল্লাসে চাতুরী ॥ * ॥ কহে কবি দ্বিজ রামচন্দ্র, নরলীলায় একি রাস রঙ্গ, ব্রহ্মরাত্রি শীমাইথে, লীলা এই ঐশ্বরী ॥ ৪ ॥

উক্ত রাগিণ্যাং ॥ আড়া তালেন গীয়তে ॥

ছাড়ি রাস মণ্ডবী অন্তর্ধ্যান করেন হরি করি চাতুরী ॥ ধ্রুং ॥ বাড়িল মদন রঙ্গ, রাস রস দিয়া ভঙ্গ, করি শ্রীরাধিকা

সঙ্গ, চলে মুরারি। প্রায় মধ্য রাত্রি গতা, পথশ্রান্তে পরি শ্রান্তা, ঘোর কান্তারে কান্তা হরি শরণী ॥ * ॥ কহে রাজ নন্দিনী, কৃষ্ণেরে স্বাধীন জানি, যথা মনোলয় তুমি চলিতে নারি ॥ ১ ॥ শুনিয়া প্রিয়ার বাণী, নায়কের চূড়ামণি, কহে শুন বিনোদিনী, আরো নাই উপায়। * ॥ স্কন্ধে কর আরো হণ, অদূরে বিশ্রাম স্থান, করিতে চরণার্পণ, লুকাইলা হরি ॥ ২ ॥ যুথেযুথে গোপীগণ, করি কৃষ্ণ অন্বেষণ, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বন, আইলেন তথা। *॥ শুনি প্রধানার ভাষা, গোপী কার নবম দশা, রামচন্দ্র করো আশা, লাজ নাই তারি ॥ ৩ ॥

কোথা গেলে নাথহে নন্দনন্দন রাসমণ্ডলী ছাড়ি। ধ্রুং ॥ করিয়া বংশীর গান, আকর্ষণ করি প্রাণ, বিনা অপরাধে বধ অবলায় করি চাতরী ॥ কি করিব কোথা যাব, কি রূপে তোমারে পাব, ঘোর কাননান্তরে, কারে জিজ্ঞাসিব ॥ * ॥ তুমিতো প্রাণের সখা, প্রাণ রাখ দিয়া দেখা, না যায় জীবন রাখা, তোমায় না দেখিয়া হরি ॥ ১ ॥ রামচন্দ্র এহি কয়, এ তোমার উচিত নয়, নাহি লোক লাজ ভয়, আপনার হৈয়া ॥ * ॥ অবলা সরলা বালা, নাহি জানে প্রেমজ্বালা, তারে মজাইলা কালা, ঘরের বাহির করি ॥ ২ ॥

সদয় উদয় হরি, মৃদু হাসি আসি অধিষ্ঠান রাসে ॥ ধ্রুং ॥ শুনিয়া গোপীর গীত, পরম আনন্দ চিত, হৈয়া গোপী অনু